দ্বিতীয় অধ্যায়

কালের যাত্রা ও উপন্যাসের সূচনা

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের ফলে ভারতবর্ষে শাসকরূপে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সূত্রেই বাঙালি সমাজ ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যবোধের সংস্পর্শে আসতে শুরু করে। বাঙালি জীবনের সর্বক্ষেত্রে অভিনবত্ব প্রকাশ পায়। বস্তুত, রাজনীতি-অর্থনীতি-শিক্ষা-ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য - সর্বস্তরেই এই নূতন প্রাণধর্ম তখন প্রকাশোন্মুখ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্ত্য জীবন দর্শন বাঙালিকে অভিনব জীবনদৃষ্টি দান করে। এর ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসের পাতায় আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠা ঘটে। বাংলা উপন্যাসের মাধ্যম বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ঘটে।

গদ্যের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে নবযুগের নবসৃষ্টির ভিত্তিভূমি তৈরি হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ ঘটে, এই অধ্যায়ে আমরা সেদিকেই আলোকপাত করছি।

ক. বাংলা গদ্যের আবির্ভাব : সামাজিক ও নান্দনিক প্রেক্ষিত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলা গদ্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বাংলা গদ্যের ধারণ ক্ষমতা, নমণীয়তা, রূপবৈচিত্র্য আজ জীবনলব্ধ সমস্ত অভিজ্ঞতার প্রকাশ মাধ্যম। এই সর্বগ্রাসী ও বহুসংস্কারী বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ঘটেছে আধুনিককালে। আর তার সর্বত্রগামী শক্তিও অর্জিত হয়েছে ক্রমান্বয়ে। মনন, কল্পনা, অনুভব উপলব্ধি নির্ভর সাবলীল সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ঘটেছে বঙ্কিমচন্দ্রে। উদ্ভবলগ্ন থেকে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলা গদ্য এই পরিণত রূপ লাভ করেছে, বাংলা গদ্যের এই পরিণত রূপকে আত্মীকৃত করবার জন্যে আমরা এখন বাংলা গদ্যের উদ্ভব লগ্নের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি।

প্রাচীন বাংলা গদ্য সংকলকদের বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থ থেকে জানা যায় খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতক থেকে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে ব্যক্তিগত ও রাজকার্যের চিঠিপত্রে।[১] তাছাড়া প্রশাসনিক দলিল দস্তাবেজ ও ধর্মীয় আলোচনায়ও তার পরিচয় পাওয়া যায়।[২] কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার কোনো ব্যবহার ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে অঙ্কুর রূপে অস্তিত্বের সূত্রে বাংলা গদ্যের ব্যবহার লক্ষণীয়। ঐ সময় ভাঙা ভাঙা গদ্যে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ে নাটক, একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এবং বিক্রমাদিত্য বেতাল কাহিনী রচিত হ'তে দেখা যায়।[৩] প্রসঙ্গত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস বিষয়ক নাটকের গদ্যভাষার উল্লেখ করা যায়।[৪] উল্লিখিত যৎকিঞ্চিৎ গদ্যের ব্যবহার দলিল দস্তাবেজে দেখা গেলেও সাহিত্যের রাজপথে তখনও তার পদক্ষেপের কোন প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এর পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই প্রয়াসের মূলে বাইরের শক্তির ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গদ্যের উদ্ভবে নিহিত সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটের আলোচনা তাই এখানে অপরিহার্য।

ধর্মীয় প্রেরণা

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া থেকেই পর্তুগীজ বণিকেরা বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বসূরী রূপেই বাংলার মাটিতে তাদের আগমন। তাদের অনুসরণ করে পর্তুগীজ মিশনারী সম্প্রদায়ও (রোমান ক্যাথলিক) এদেশে পদার্পণ করেন। এঁরা ছলে-বলে-কৌশলে বাংলার গ্রামে গ্রামে গির্জাঘর বানিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের খ্রীষ্টান করতে শুরু করেছিলেন। এই ধর্মান্তরীকরণকে জোরদার করবার প্রয়োজনে কোন কোন ধর্মযাজক রহু পরিশ্রম করে কিছু কিছু বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। বাংলা ভাষার কোন ব্যাকরণ না থাকায় তাঁরা চেষ্টা করে পর্তুগীজ-বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করেন। কেউ কেউ হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্যে দু-একটি গ্রন্থও লিখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে পর্তুগীজ মিশনারী মনোএল-দা আস্সুম্পসাঁউ ও দোম আন্তোনিও দো রোজারিও এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মনোএল, পর্তুগীজ-বাংলা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ সংকলন করেছিলেন। গ্রন্থটির পর্তুগীজ নাম 'Vocabulario em Idioma Bengalla e portuguez' (১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)। গ্রন্থটিতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নিয়মাবলী সংকলন করে বাংলা ও পর্তুগীজ শব্দের অভিধান সংগ্রহ করেন। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ'।[৬] এতে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব ও আচার আচরণ ব্যাখ্যা করেছেন।

দোম আন্তোনিও দো রোজারিও[৭] রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'।[৮] গ্রন্থটিতে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও হিন্দুধর্মের অসারতা প্রতিপাদিত হয়েছে। তবে তার ভাষাভঙ্গিমা মনোএলের চেয়ে অধিকতর সুগম।[৯] বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে পর্তুগীজ মিশনারীদের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট সমালোচক পর্তুগীজদের দ্বারা রচিত গদ্যরচনাকেই "বাঙলা গদ্যের প্রকাশ্য ব্যবহারের সূত্রপাত"[১০] বলে দাবি করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পর্তুগীজ মিশনারীদের প্রবর্তিত রচনারীতির কোন প্রভাব পরবর্তীকালের বাংলা গদ্যে লক্ষণীয় নয়। ইংরেজ বণিকদের কাছে পর্তুগীজ বণিকদের পরাজয়ের ফলে ইংরেজদের প্রতিপত্তিই প্রতিষ্ঠিত হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই অপসূয়মান শক্তির ক্ষীণ প্রচেষ্টা সাবলীলরূপ লাভ করতে পারেনি। শাসক হিসেবে ইংরেজশক্তির অভ্যুদয়ের সাথে সাথে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও ইংরেজ মিশনারীদের সহায়তায় বাংলা গদ্যের উদ্ভবের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হতে থাকে।

প্রশাসনিক প্রেরণা : মুদ্রণ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশের প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভ করে। তাদের প্রশাসনিক স্বার্থেই বাংলা ভাষার প্রয়োজন জরুরী হয়ে পড়ে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের জন্যে দুই ভাষার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজনরূপে দেখা দেয়। আর এই প্রয়োজনের তাগিদে প্রথম সাড়া দেয় শাসকপক্ষ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির

কর্মচারী হালহেড সাহেব কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের ভাষা শিক্ষার সুবিধার্থে 'A Grammar of the Bengal Language' (১৭৭৮) রচনা করেন। তাঁর ব্যাকরণ প্রকাশ উপলক্ষেই বাংলা মুদ্রণ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। তাঁর ব্যাকরণ ইংরেজি ব্যাকরণের আদর্শে এবং ইংরেজি ভাষায় রচিত হ'লেও মূলনীতিগুলির উদাহরণ হিসেবে বহু বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থটি শুধু কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের জন্য রচিত বলে বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক নামমাত্র। এই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোন কোন বাংলা জানা ইংরেজকর্মচারী কোম্পানির শাসনবিধি সংক্রান্ত ইংরেজি আইনের বাংলা তর্জমা করে ছাপিয়ে ছিলেন। তাছাড়া কেউ কেউ বাংলা শিখে বাংলার মাধ্যমে কিছু কিছু 'ওয়ার্ড বুক' ধরণের পুস্তিকা ও অভিধান প্রকাশ করেছিলেন। এর মধ্যে ফরস্টার সাহেবের দুই খণ্ডে রচিত Vocabulary বা ইংরেজি বাংলা অভিধান(১৭৯৯-১৮০২) সেযুগে বাঙালির ইংরেজি শিক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে এসব ছোটখাট দৃষ্টান্ত শুধু প্রত্নতত্ত্বের নজির হিসেবে উল্লেখযোগ্য, বাংলা গদ্যসাহিত্যের সঙ্গে এর সংযোগ নিতান্তই অল্প।[১২] তবে বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভবে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামপুর মিশন : মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন

বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্বে কয়েকজন ইংরেজ মিশনারী খ্রীস্টধর্ম প্রচারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উইলিয়াম কেরি ও টমাস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুরে এঁদের প্রতিষ্ঠিত মিশন বাংলাদেশে নূতন করে খ্রীস্ট ধর্মপ্রচারের উদ্যোগ নিয়েছিল। এই মিশনের ধর্মযাজকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাইবেলের অনুবাদ করে হিন্দুদের মধ্যে খ্রীস্ট-ধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলা।

শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোক্তা উইলিয়াম কেরি এবং টমাসের সহযোগী ছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রমুখ। এঁদের প্রচেষ্ঠায় মিশন প্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। এই মুদ্রা যন্ত্রের সাহায্যে কেরি ও তার সহকর্মীরা বাইবেলের বহু ভাষায় অনুবাদ করেন। তবে এঁরা শুধু বাইবেলের অনুবাদই করেননি।[১২] শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এবং খ্রীষ্ট প্রসঙ্গকে দেশবাসীদের বোধগম্য ও উপভোগ্য করে তোলার আগ্রহেই গদ্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের কৌতূহল ভাষার মৌল প্রবণতার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিল। বস্তুত তাঁদের চেষ্টার স্বাতন্ত্র্যই বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের মুক্তি সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছে। আধুনিক গদ্য সাহিত্য গঠনের এই হ'লো প্রস্তুতির পথ। শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে বাংলা গদ্যের হাঁটি হাঁটি পা-পা লগ্নের যোগ তাই ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে বাংলা মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপন ও ব্যাকরণ প্রণয়নের দ্বারা শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্যরচনারীতিকে নিয়ম শৃঙ্খলায় বাঁধতে এবং গদ্যগ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিতে সাহায্য করেছেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মিশনারীদের এই উদ্যোগ এবং দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রশাসনিক তৎপরতার সম্মিলণ ঘটে। বাংলা গদ্যের বিকাশে এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

লর্ড ওয়েলেস্লির উদ্যোগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজে বিভিন্ন প্রদেশের আধুনিক ভাষা এবং পুরাতন যুগের সংস্কৃত, উর্দু, ফারসী প্রভৃতি ভাষা শেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাইবেলের অনুবাদ করে কেরি শাসকমহলে পরিচিত হয়েছিলেন। এর ফলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগে তিনি অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন। বিদেশীদের বাংলা শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি বাংলা গদ্যগ্রন্থের অত্যন্ত প্রয়োজন অনুভব করলেন। এই প্রয়োজনের তাগিদে তিনি নিজে বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনায় হাত দিলেন। আবার দেশীয় পণ্ডিত মুন্সীদেরও গদ্যগ্রন্থ লেখার জন্য উৎসাহিত করলেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশীয় পণ্ডিত-মুন্সিরা

এগিয়ে এলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দুজন পণ্ডিত-মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বাচস্পতি এবং সহকারী হিসেবে শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত রূপে গদ্যপাঠ্য পুস্তকের উদ্ভব ঘটে।

বাংলা গদ্যের উদ্ভবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উইলিয়াম কেরি এবং তাঁর সহকারী পণ্ডিত-মুন্সীদের রচিত গদ্যগ্রন্থের একটা তালিকা দেওয়া হ'লো -

গ্রন্থকার	গ্রন্থ
১। উইলিয়াম কেরি	'কথোপকথন' (১৮০১)
	'ইতিহাসমালা'(১৮১২)
২। রামরাম বসু	'রাজাপ্রতাপাদিত্য চরিত্র'(১৮০১)
	'লিপিমালা'(১৮০২)
৩। গোলকনাথ শর্মা	'হিতোপদেশ'(১৮০২)
৪। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	'বত্রিশ সিংহাসন'(১৮০২)
	'রাজাবলি'(১৮০৮)
	'প্রবোধচন্দ্রিকা'(১৮৩৩ খ্রীঃ মুদ্রিত বলে অনুমান করা হয়)
	'হিতোপদেশ'(১৮০৮)
	'বেদান্তচন্দ্রিকা'(১৮১৭)
৫। তারিণীচরণ মিত্র	'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট-ঈশপস ফেবল্‌সের অনুবাদ'(১৮০৩)
৬। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫)

৭। চণ্ডীচরণ মুন্সী	'তোতা ইতিহাস'(১৮০৫) (তুতিনামা নামক ফারসী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)
৮। রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	'হিতোপদেশ'(১৮০৮)
৯। হরপ্রসাদ রায়	'পুরুষ পরীক্ষা'(১৮১৫) (বিদ্যাপতির পুরুষ পরীক্ষা নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ)
১০। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন	'পদার্থতত্ত্ব কৌমুদী' (১৮২১) 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী'(১৮২২)

উপরোক্ত লেখকদের মধ্যে উইলিয়াম কেরি, রামরাম বসু এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাদের প্রচেষ্টা ও রচনা বাংলা গদ্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উইলিয়াম কেরি, বাঙালি সমাজে প্রচলিত পুরাণ ও কিংবদন্তী থেকে প্রাপ্ত গল্প-কাহিনী গুলোকে বাংলা ভাষায় সিভিলিয়ান ছাত্রদের মধ্যে পরিবেশন করেছেন। তাঁর 'কথোপকথন' কথ্য ঢং-এ লেখা। 'ইতিহাসমালা' আবার প্রাঞ্জল সাধুগদ্যে লেখা। গ্রন্থটির অনেক গল্প সাধারণ ব্যক্তির মুখে শুনে লেখা। মোট গল্পসংখ্যা দেড়শ। সুকুমার সেন মনে করেন বাংলা সাহিত্যে প্রথম গল্পের বইয়ের মর্যাদা ইতিহাস মালারই প্রাপ্য। তাঁর মতে গ্রন্থটি যথোপোযুক্ত সমাদর পেলে বাংলায় গল্প উপন্যাসের উদ্ভব আরো আগেই সম্ভবপর হ'তে পারতো।[১৩]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজগোষ্ঠীর দেশীয় পন্ডিতদের মধ্যে রামরাম বসু সর্বাগ্রগণ্য। বাঙালিদের মধ্যে তাঁর গ্রন্থ 'রাজাপ্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেছিল। গ্রন্থটির ঐতিহাসিক ঘটনা ও বর্ণনার প্রথম লেখক হিসেবে তিনি যথার্থই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে গ্রন্থের অন্বয় অতি বিশৃঙ্খল এবং কারণে-অকারণে অজস্র আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ গ্রন্থটির মারাত্মক ত্রুটি।[১৪] তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'লিপিমালা'। গ্রন্থটির ভূমিকায় নিবেদিত - 'দেশি ভাষা ও আচরণাদিতে বিদেশী শাসকগণকে অভিজ্ঞ করে তোলার জন্যেই গ্রন্থটির উৎপত্তি।'[১৫] গ্রন্থ উৎপত্তির উদ্দেশ্য যেমন স্পষ্ট, তেমনি গদ্য উদ্ভবের কারণও

প্রতীতি হয়। গ্রন্থটি আসলে কিছু সংখ্যক আদর্শ পত্র রচনার নিদর্শন। বাংলা গদ্যভাষার সুষ্ঠু অন্বয়রীতি আবিষ্কৃত না হলেও শব্দের প্রয়োগ এখানে প্রাঞ্জলতর হয়ে উঠেছে। এভাবে গদ্য ক্রমশঃ আড়ষ্টতা মুক্ত হতে থাকে। এবং গদ্যের একটা নিজস্ব ঢং গড়ে উঠে। ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত সাহিত্যিক গদ্য হিসেবে পূর্ণরূপ অর্জন না করলেও সুপ্টিলগ্নের গদ্যভাষাকে তিনি একটআদর্শ আকৃতি দিয়েছিলেন।[১৬]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজগোষ্ঠীর খ্যাতিমান লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙকার। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে তাঁর বিচিত্রগামী মননশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন ধরণের বাংলা গদ্য রচনায় তিনি ব্যাপক কৌতূহলের পরিচয় দিয়েছেন।[১৭] তাঁর গদ্যভাষায় বিষয়োপযোগী প্রয়োগ কুশলতার প্রয়াস লক্ষণীয়। এখানে উল্লেখযোগ্য —

> কথ্য এবং সাধু উভয় রীতিতেই মৃত্যুঞ্জয় রচনা - কুশলতা দেখাইয়াছেন। তবে তাঁহার রচনা সে যুগের রচনা রীতির সাধারণ দোষ হইতে নিষ্মুক্ত নয়। স্থানে স্থানে সংস্কৃতানুসারী হওয়াতে ভাষাও সর্বত্র সুগম নয়।[১৮]

কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের পূর্বে তিনিই উল্লেখযোগ্য গদ্যশিল্পী। তাঁর ক্লাসিক ও সাধুরীতিই বিদ্যাসাগরের মধ্যে অধিকতর সুষ্ঠ শিল্পরূপ লাভ করেছে।[১৯] সবশেষে মনে রাখা প্রয়োজন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর স্কন্ধে অতর্কিতভাবে বিদেশীদের দেশীয়ভাষা শিক্ষাদানের জন্য গদ্যগ্রন্থ রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। এর ফলে লেখকদের স্বাধীনতা ও উদ্দেশ্য দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ ছিল। বস্তুত, ফোর্টউইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠী ভাষার নূতন প্রয়োগের জন্য সচেতনভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। গদ্যরীতির উৎকর্ষ যথার্থ মৌলিক মনন ও চিন্তার স্বচ্ছতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলজে গোষ্ঠীর বাঁধা পথ ছেড়ে হাঁটবার অবকাশ ছিল না।

তা সত্ত্বেও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙকার বাঁধা পথ ছেড়ে নূতন পথে পদক্ষেপের প্রয়াস দেখিয়েছেন। আসলে তিনি ছিলেন সংস্কৃতে

পন্ডিত। ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। সেজন্যই ঐতিহ্যহীন, অপাংক্তেয় বাংলা গদ্যের মধ্যেও কিছুটা মর্যাদা, রুচিবোধ ও ছন্দস্পন্দের একটা ক্ষীণ আভাস প্রবর্তন করেছেন।[২০]

কেরি, মৃত্যুঞ্জয় এবং রামরাম বসু ছাড়াও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে যুক্ত আরও অনেকে বাংলা গদ্য রচনায় সচেষ্ট ছিলেন। এদের মধ্যে চন্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রাজীবলোচনের গদ্য গঠনভঙ্গি তদানিন্তন বিচারে অন্যান্য রচনার তুলনায় অনেক সরল ছিল। আবার কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের রচনার গঠনভঙ্গি ছিল ঠিক এর বিপরীত। গোলকনাথ শর্মা ও হরপ্রসাদ রায়ের রচনার গঠণরীতিতে কোন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুত, ফোর্টউইলিয়াম কলেজের তত্ত্বাবধানে আরো কিছু পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই কোনো নিদর্শণ রক্ষিত নেই। যেমন রামকিশোর তর্কচূড়ামণির 'হিতোপদেশ' গ্রন্থের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়নি। আবার, ছাত্রদের পাঠ সহায়তার জন্য এমন কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, বাংলা গদ্যের বিকাশে যদিও এদের প্রভাব ছিল নামমাত্র কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্যের বিচারে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের বাংলা ইংরেজী শব্দকোষ। বাংলা গদ্যের বিকাশের সঙ্গে এই সমস্ত প্রচেষ্ঠার সরাসরি কোন যোগসূত্র না থাকায় সেগুলো আমাদের আলোচনার গন্ডী-বর্হিভূত।

বাংলা গদ্যের উদ্ভবলগ্নে ফোর্টউইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকা সত্ত্বেও তাদের হাতে কোনো আদর্শ গদ্যরীতি গড়ে উঠেনি। এর প্রধান অন্তরায় ছিল -

ক) শব্দনির্বাচনে ও সন্নিবেশে অপটুতা।

খ) দুরান্বয়ের জন্য বাক্যাংশ সমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধবোধে অনিশ্চয়তা ও

গ) সমগ্র বাক্যটির দৈর্ঘ্য ও ভারসাম্য নিরূপণে সুমিতিহীনতা।[২১]

এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হয় যে তাঁদের প্রচেষ্টাতেই বাংলা গদ্যের বন্ধনমুক্তি ঘটে। বাংলাসাহিত্যে নূতন যাত্রা সংযোজিত হয়। বাংলা গদ্যরীতির ক্রমোন্মেষ সূচিত হয়। সর্বোপরি শাসকের প্রয়োজনের তাগিদ সমাজের প্রয়োজন হিসেবে দেখা দেয়। শুরু হয় বাংলা ভাষার নিরন্তর প্রগতি।

সামাজিক প্রেক্ষিত

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর গদ্যচর্চা পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে এই গদ্যের প্রথম প্রয়োগ করেন রামমোহন রায়। ধর্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, রাজনৈতিক আন্দোলন - সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর ভূমিকা পথিকৃৎ-এর। নবযুগের প্রেরণায় তিনি বিবিধ কর্মোদ্যোগের ধারক হয়ে উঠেছিলেন। বাংলা গদ্যের পরি-পুষ্টি সাধনেও তিনি যত্নবান ছিলেন। ধর্মসংস্কার ও সমাজচেতনার বশবর্তী হয়েই বাংলা গদ্যকে তিনি আয়ুধ রূপে ব্যবহার করেছিলেন। বস্তুত বিশুদ্ধ সাহিত্যরস বা শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসে তিনি কলম ধরেননি, ধর্মসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তিনি সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ খুঁটিয়ে পড়েছিলেন। সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শাস্ত্রগ্রন্থাদি তিনি বাংলাগদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদগ্রন্থগুলো সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে বহুকাল প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য দম্ভের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। তাঁর অনুবাদ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

বিতর্কমূলক রচনার মধ্যে 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার'(১৮১৮), 'গোস্বামীর সহিত বিচার'(১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ'(১৮১৮-১৯), 'কবিতাকারের সহিত বিচার'(১৮২০), 'ব্রাহ্মণ সেবধি'(১৮২১), 'পথ্য প্রদান'(১৮২৩), 'সহমরণ বিষয়ক'(১৮২৩) প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩), 'ব্রহ্মসঙ্গীত'(১৮২৮), 'সম্বাদ কৌমুদী(পত্রিকা, ১৮২১) প্রভৃতি রচনা করে তাঁর বিচিত্র ও ব্যাপক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

ফোর্টউইলিয়াম কলেজগোষ্ঠী বাংলা গদ্যকে কাহিনী ও গালগল্প প্রকাশের মাধ্যম করেছিলেন। রামমোহন সেই গদ্যকে যুক্তিতে, তর্কে, চিন্তায় আধুনিক চিন্তাশীল মনের উপযোগী করেন। প্রসঙ্গত তার গদ্যভাষার দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'লো —

> বলাৎকারে কোন স্ত্রীকে বন্ধন করিয়া, পরে অগ্নি দিয়া দাহ করা, এ সর্বশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এবং অতিশয় পাপের কারণ হয়। এরূপ স্ত্রী বধেতে একদেশীয় লোকের কি কথা ? যদি তাবৎ দেশের লোক ঐক্য হইয়া করে, তথাপি বধ কর্তারা পাতকী হইবেক, অনেকে ঐক্য হইয়া বধ করিয়াছি, এই কথার ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারেনা, যে২ ক্রিয়ার শাস্ত্রে কোন বিশেষ নিদর্শন নাই, সে স্থলে দেশাচার ও কুলধর্মানুসারে সে ক্রিয়াকে নিষ্পন্ন করিবেক, কিন্তু সর্বশাস্ত্র নিষিদ্ধ যে জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীবধ তাহা কতিপয় মনুষ্যের অনুষ্ঠান করাতে দেশাচার হইয়া সৎকর্মে গণিত কদাপি হয় না।[২২]

নিজমত প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্ব প্রতিপাদনের আগ্রহে তিনি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নিজ বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন। বাদানুবাদের মাধ্যম হিসেবে বাংলা গদ্যকে উপযুক্ত রূপ দিয়েছেন। তাঁর ভাষা প্রসঙ্গে ঈশ্বরগুপ্ত বলেছেন —

> দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতিসহজে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও মিষ্টতা ছিল না।[২৩]

সমসাময়িক বাংলা গদ্যের দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। এর ফলে তাঁর রচনা ভঙ্গি সরল ও সুষম হয়েছিল। পাঠকের কাছে বোধ্য হয়েছিল। এতে রামমোহনের মনীষা'র প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু 'সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও মিষ্টতা ছিল না'

- এর মাধ্যমে সাহিত্যগুণ যে প্রকাশ পায়নি, সমালোচক তাই যেন বুঝাতে চেয়েছেন। গদ্য রীতি লেখকের অভিপ্রায়, মনোভঙ্গি ও মননের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। রামমোহন সমাজ সংস্কার ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রবর্তক। তাই তাঁর গদ্যে বিচার-কুশল তার্কিকের ভূমিকাই প্রধান। ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের আবর্তে তিনি নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। আর সমস্ত সমস্যার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আয়ুধ ছিল তাঁর লেখনী। সমস্যা-সংকুল সামাজিক জীবনের প্রেরণাই ছিল তাঁর গদ্যভাষার প্রধান উৎস। প্রকৃতপক্ষে সেজন্যই তাঁর ভাষা সাহিত্য রস সমৃদ্ধ না হয়ে, হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যুক্তি- দীপ্ত গদ্যভাষা। মৌলিক চিন্তা চেতনা প্রকাশের উপযোগী ভাষা।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন যতিহীন বাংলা গদ্য অর্থপ্রকাশে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে। তাই তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজি গদ্যরীতির অনুসরণে যতিচিহ্ন দিতে আরম্ভ করেন এবং সংলাপে 'ড্যাশ' ব্যবহার করেন। গদ্যশৈলীর ক্রমোন্মেষে রামমোহনের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বস্তুত, রামমোহন রায়ের সময়েই তাঁর রচিত গ্রন্থ এবং তদুত্তরে পৌত্তলিক মতাবলম্বী ভট্টাচার্য মহাশয়দের রচিত গ্রন্থ ও পত্রিকার মাধ্যমেই 'বিশুদ্ধ বাঙ্গালা গদ্য রচনার রীতি প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল।'[২৪] তাঁর প্রবর্তিত যুক্তিনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী গদ্যই বিদ্যাসাগরের হাতে সাহিত্যগুণান্বিত হয়ে ওঠে। বস্তুত, রামমোহনের উত্তরসূরী রূপেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। নবজাগরণের যে প্রদীপশিখা রামমোহন প্রজ্বলিত করেছিলেন, পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় তা বাংলার সমাজমননকে উদ্দীপিত করেছিল।

বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সমাজ কল্যাণমূলক কর্মে গতি সঞ্চারের জন্য তিনি যুক্তিমূলক প্রবন্ধ রচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। শিক্ষক ও সমাজসেবীর ভূমিকা থেকেই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এর ফলে তাঁর সাহিত্য রচনা শিল্পচেতনা অপেক্ষা সমাজবোধের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক।

বাল্যবিবাহ ও কৌলীণ্য প্রথার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সমাজে বহুনারীর অকাল বৈধব্য ঘটেছে। বালবৈধব্য পরিবারে তথা সমাজে সংকট রূপে দেখা দিয়েছিল। বিধবা-বিবাহকে সমর্থন করে বিদ্যাসাগর দুটো গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম গ্রন্থ 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'(১৮৫৫) প্রকাশের ফলে বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠে। এই গ্রন্থের প্রতিবাদ খন্ডনার্থে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এত-দ্বিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয় পুস্তক'(১৮৫৫) রচনা করেন। তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কর্মের বিবরণ দেওয়া এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মনে রাখা দরকার সমাজসংস্কার মূলক কর্মে প্রণোদিত হয়েই তিনি সৃষ্টিকর্মে এগিয়ে এসেছেন। বাংলা গদ্যের উদ্ভবে সামাজিক কারণের অনুসন্ধানে এ আলোচনা তাই অপরিহার্য।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তার প্রথম গ্রন্থ রচনার পরই প্রতিপক্ষদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রতিপক্ষদের লক্ষ্য ছিল বিদ্যাসাগরের নামে অলীক কুৎসা প্রচার করা। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা উল্লেখযোগ্য —

অগাধ সাগর বিদ্যাসাগর তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের কুলতরী অকূলেতে কূল পেলনা॥

আর একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা —

সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায় ?
কিছুই না হতে পারে, মুখের কথায় ॥
মিছামিছি অনুষ্ঠানে মিছে কাল হরা ।
মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা॥

সকলেই তুড়ি মারে, বুঝে নাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে, সাগরের ঢেউ॥
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙঘন।
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন॥
নচেৎ না দেখি কোন, সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই-হই উপহাস সার॥

বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত অবহিত ছিলেন। তাই বলেছেন 'সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে, সাগরের ঢেউ।' আর সেজন্যই বিদ্যাসাগরের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে বলেছেন 'সাগর যদ্যপি ... বিবাহ ঘটন॥' সাগরের ঢেউ সীমা লঙঘন করেনি। কিন্তু সাগর (বিদ্যাসাগর) এসমস্ত বিদ্রূপ-কটাক্ষ লঙঘন করে বিধবা বিবাহ ঘটিয়েছেন। এর জন্য তাঁকেও লিখতে হয়েছে নানা প্রতিবাদ। বিভিন্ন প্রতিবাদীদের হাস্যকর অভিমতকে ছিন্ন ভিন্ন করেছেন যুক্তির আলোকে। এ সমস্ত বাদ প্রতিবাদ তৎকালীন সংবাদপত্রের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজে। বলা বাহুল্য এই বাদ প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে যুক্তি তর্কের উপযোগী গদ্য সাহিত্যিক গদ্যে রূপান্তরিত হবার আশ্রয়ভূমি খুঁজে পেয়েছে।

সরস ব্যঙ্গের ভাষায় তিনি লিখেছেন 'অতি অল্প হইল'(১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল'(১৮৭৩), 'ব্রজবিলাস'(১৮৮৪)। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' - এই ছদ্মনামে গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'(১ম-১৮৭১, ২য়-১৮৭৩) প্রভৃতি তার সমাজ সংস্কারমূলক চেতনারই ফলশ্রুতি। অনুবাদের মাধ্যমেও বাংলা গদ্যরীতির উন্নতি কল্পে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

বাংলা গদ্যভাষাকে তিনি যে অবস্থায় পেয়েছিলেন, - " তাহাতে ব্যাকরণের দিক হইতে কোন শৃঙখলা ছিল না, বাক্যগঠন ও পদবিন্যাসের একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিলনা

এবং বাক্যে কোন সৌষ্ঠব ছিলনা। তাছাড়া সন্ধি সমাস ঘনবাক্যের মধ্যে গ্রাম্য শব্দ ও আরবি ফারসি শব্দের মিশ্রণ ছিল। বাক্যগুলি গাঢ়বন্ধ ছিল না - তাহার মধ্যে ওজন বোধেরও পরিচয় ছিলনা।" [২৫] সমাজ কল্যাণের অভিমুখে স্বীয় সাহিত্যে প্রচেষ্টাকে চালিত করে গদ্য সাহিত্যের দ্রুত উন্নতির মাধ্যমে আপন প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। প্রসঙ্গত তার গদ্যরীতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'লো —

> হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ। ... তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রী-জাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধান দোষে সংসার তরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়। যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সেদেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।
>
> হা অবলা গণ! তোমরা কি পাপে - ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারিনা। [২৬]

সমাজ সংস্কারকের এই মানবিক আবেদন সামাজিক ইতিহাসের এক নূতন বস্তু। তাঁর গদ্যশৈলী এই মানবিক আবেদন সংক্রান্ত বলেই তাঁর রচনায় 'সাহিত্যিক গদ্যের সূত্রপাত'। [২৭] তার গদ্যে যতির সন্নিবেশে এবং সুললিত শব্দ বিন্যাসের মাধ্যমে বাক্যে রসসঞ্চার ঘটেছে।

বাংলা গদ্যে এই ধ্বনি ঝঙ্কার ও সুরবিন্যাসের সূচনা তাঁর হাতেই। তাঁর পরিকল্পিত সাধু ভাষাই পরবর্তীকালে সৃষ্টিশীল কল্পনা প্রতিভার প্রকাশের মাধ্যম হয়েছে। গদ্যরীতির ক্রমবিবর্তনে তাঁর হাতেই বাংলা গদ্য একটি সৌষ্ঠবময় ও সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপ লাভ করে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য —

> বাংলা ভাষাকে পূর্ব প্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভাব হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্ব ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি-সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষা রূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।[২৮]

তাঁর সৃষ্ট ভাষায় যুগোচিত বৈশিষ্ট্য বহু ধারায় বিকশিত হয়েছে। তাই তাঁর গদ্য সাহিত্যিক গদ্য। কিন্তু তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে এ গুণ লক্ষ করা যায় না। বাংলা গদ্য ভাষা ও গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর তাই অদ্বিতীয়। জনকল্যাণ তথা সমাজকল্যানই তাঁর রচনার মূল উদ্দেশ্য। "বিশুদ্ধ, সাহিত্য সৃষ্টির অসামান্য ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি সে প্রলোভন ত্যাগ করে শুধু সমাজের কল্যাণের অভিমুখে নিজের সাহিত্য-চেষ্টাকে চালিত করেছিলেন।"[২৯] এর ফলেও ফলপ্রসূ হয়েছে গদ্যসাহিত্য।

রামমোহন সমাজ সংস্কারকের যে আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন, সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে তাঁর বক্তব্যে। ভাষা তখনো প্রাঞ্জল হয়ে উঠেনি। ভাষার প্রাঞ্জলতা আনয়নে প্রভূত সাহায্য করেছে সাময়িকপত্র। সংবাদপত্রে প্রতিদিনের প্রয়োজনের তাগিদে লেখার সূত্রপাত হয়। এই লেখার লক্ষ্য শুধু মুষ্টিমেয় ছাত্রসমাজ নয়, অগণিত পাঠকসমাজ। এই সাংবাদিকতার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে পরিশীলিত হ'তে থাকে বাংলা গদ্য। সংবাদপত্রের মাধ্যমে গদ্য কিভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে এ নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। আমাদের এখানে মনে রাখা দরকার উনিশ শতকের গোড়া থেকে সামাজিক জীবনের সমস্যা, সংঘাত ও জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যভাষারও বিকাশ হতে থাকে। সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলো সেই বিকাশের পথে সহায়ক হয়েছে। গদ্যভাষা মূলত বুদ্ধিপ্রধান ও যুক্তিপ্রধান ভাষা। প্রাঞ্জলতা, প্রত্যক্ষতা, বলিষ্ঠতা, গতিশীলতা তার প্রধান ধর্ম। পাঠ্যপুস্তক রচনায় পণ্ডিত লেখকেরা এই সব গুণের সমবেশ করতে পারেননি। সমস্যা সংকুল ও সংঘাতমুখর আধুনিক সামাজিক পরিবেশে সক্রিয় ও সচেতনভাবে সমাজ সংগ্রামের ও শিক্ষা সংস্কারের শক্তিশালী হাতিয়ার রূপেই বাংলা গদ্যকে গড়ে তুলেছেন বিদ্যাসাগর। শাসকের প্রয়োজনে যে বাংলা ভাষার চর্চা জরুরী হয়ে উঠেছিল, তা পরে সমাজের প্রয়োজনে পরিশীলিত হয়েছে। আর এই সমাজের প্রয়োজনে গড়ে উঠা বাংলা গদ্যের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে সৌন্দর্যবোধ যার ফলস্বরূপ মনন ও উপলব্ধি নির্ভর সাবলীল গদ্য ভাষার আবির্ভাব ঘটে।

নান্দনিক প্রেক্ষিত

যুগ ও পরিবেশ ব্যক্তির বাণী ভঙ্গিকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। সাহিত্যিক রীতি বা স্টাইল, কি গদ্যে কি পদ্যে, দুটি শক্তির প্রভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, একটি লেখকের ব্যক্তিগত শক্তি, অপরটি যুগের বা সমাজের শক্তি।" [৩০] লেখকের শক্তি তাঁর নিজস্ব। সমাজের শক্তি

তুলনায় সার্বজনীন। ফোর্টউইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠা। পক্ষান্তরে রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা। তাই রসসাহিত্যের প্রেরণা তখনো ছিলনা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষার তাগিদে যৌলিক ভাবনা চিন্তার চিন্তার বাহন হিসেবে গদ্যকে অবলম্বন করেন। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, বিজ্ঞান, রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যম রূপে গদ্য গড়ে উঠে। এর ফলে বাঙালি নূতনের স্বাদ পায়। বুদ্ধিজীবী পাঠকের কাছে এর আবেদন সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নবজাগ্রত বাঙালির সৌন্দর্যবোধ তাতে তৃপ্ত হয়নি। বিষয় এবং ভাষার কাঠিন্যে সাধারণ পাঠক সমাজে আন্তরিক আবেদন গড়ে উঠেনি। বস্তুত পাঠক সমাজের চাহিদা পূরণের প্রত্যাশায় সরস রচনার প্রতি স্বাভাবিক কারণেই আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

সবচেয়ে বড় কথা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে দেশবাসীর মধ্যে জ্ঞানচর্চার ও জীবনকে বিভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করার প্রেরণা জাগে। এর ফলে অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের প্রতিও দৃষ্টি পড়ে। নারী কল্যাণ তথা সমাজ কল্যাণের তীব্রানুভূতি থেকে আমরা পেলাম বিদ্যাসাগরের গদ্য। পারিবারিক ও সামাজিক ভূমির কেন্দ্রে যেহেতু নারী, সেজন্যে বাঙালি সমাজের নারী-কুলের চিত্তবিকাশের জন্য প্যারীচাঁদ তাঁর সাহিত্য প্রতিভা নিয়োজিত করেন। তিনি বাংলা গদ্যের বিষয় এবং ভাষা উভয়ক্ষেত্রেই অভিনবত্বের সূচনা করেন। সে যুগের সংস্কৃতানুসারী সাধু গদ্য তার হাতেই চলিত রূপ লাভ করে। বাংলা গদ্যের বিকাশে প্যারীচাঁদের এই অবদানকে বঙ্কিমচন্দ্রও স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৩১]

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল বিশেষতঃ নারীকুল। সেকালের অনতি শিক্ষিত সাধারণ নরনারীর বোধগম্যতার কথা ভেবেই প্যারীচাঁদ চেয়েছিলেন বাংলা সাধুগদ্যের সরলীকরণ। মাসিক পত্রিকার ভাষা দৈনন্দিন ব্যবহার উপযোগী করার জন্য তিনি কৃতসংকল্প হন।[৩২] আর সেজন্যই খাঁটি বাংলার প্রাণ-নির্ভর ভাষার দিকে তিনি ঝুঁকেছিলেন।

উনিশ শতকের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তি কালীপ্রসন্ন সিংহ। তিনি বাঙালির সামাজিক জীবনের উন্নতির নানান কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় চলিত ভাষা নির্ভর রচনা রীতি প্রয়োগ করেন। ভাষা প্রয়োগে কোলকাতার চলিত মার্জিত-অমার্জিত সাধারণ লোকদের ব্যবহৃত সব ভাষাকেই প্রয়োগ করেছেন। এভাবে তিনি অপাঙ্‌ক্তেয় মৌখিক ভাষায় শক্তি আবিষ্কার করেছেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা গদ্যরীতির স্তরে স্তরে অগ্রগতি লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও সভ্যতা বাঙালির জাতীয় জীবনে, সামাজিক জীবনে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। উনিশ শতকের বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, সভাসমিতি, সংগঠন, গ্রন্থরচনা এবং জীবনবোধের প্রকাশ মাধ্যম হয় গদ্য। বাংলা গদ্যের গঠন দৌর্বল্য এবং রসসাহিত্যের অভাবহেতু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লেখায় ও পাঠে ইংরেজি গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্যে গল্পকাহিনী রচনার প্রবণতা তীব্রতর হয়েছিল। গল্প পিপাসু বাঙালির সৌন্দর্যবোধ ও প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে অনুবাদের মাধ্যমে। লক্ষণীয় সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনে সৃষ্ট মৌলিক রচনার পাশাপাশি অনুবাদের ধারাটিও ক্রমশঃ পুষ্টি লাভ করছিল।

বিচারবুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির সমন্বয় বাংলা গদ্যরীতির বৈচিত্র্য সাধন করে। সীমিত অর্থের পরিসরে আবদ্ধ ভাষার মধ্যে নির্বিশেষ ব্যঞ্জনা ধ্বনিত করাই রসসাহিত্যের সার্থকতা। শিল্পীর সুনিপুণ কল্পনার যোগে গদ্যের রূপরীতির সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়। গদ্যও ধীরে ধীরে মনন ধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে হৃদয়ের ভাষা হয়ে ওঠে। এই পথেই সৌন্দর্য সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যাখ্যানে সাংবাদিকতার গদ্য বিদ্যাসাগরের ধারাতেই পুষ্ট হয়েছে। তিনি বাংলা গদ্যের শক্তি ও সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছিলেন। প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন প্রমুখ গদ্যশিল্পীর চেষ্টায় ক্রমশঃ তা রসসাহিত্যের উপযোগী হয়ে উঠে। পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা-স্পর্শে তা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

লেখকের যথার্থ সৃজনী প্রতিভার গুণেই ভাষা হয়ে ওঠে প্রাঞ্জল। বাংলা গদ্যের এই রূপটি বঙ্কিমে এসে উন্মোচিত হয়। এপ্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার তাঁর পূর্বেই ধীরে ধীরে ব্যবহারিক প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে বিচারবুদ্ধি ও গভীর কল্পনা শক্তির সমন্বয়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যিক সম্ভাবনায় বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হয়। তাঁর পূর্ববর্তী গদ্য সাধকেরা গদ্যের রূপ গঠনে বিভিন্নমুখী প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। তিনি সেই গদ্যরূপের সমন্বয় সাধন করে রস সাহিত্যের বাহন রূপে বাংলা গদ্যের শক্তি ও সৌন্দর্যের সমন্বয় করেন। স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি ও আবেগের স্পর্শে তাঁর গদ্য তাই প্রাণবন্ত। মাধুর্যমণ্ডিত। ভাষার এই সূক্ষ্মতা ও শিল্পবোধের নিরিখেই রচনা প্রসাদ গুণান্বিত হয়ে ওঠে। এতে লেখকের সৃজনী-শক্তি ও সৌন্দর্যানুভূতি দুয়েরই পরিচয় নিহিত থাকে।

বাংলা গদ্যের এই রূপ পরিস্ফুট হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ যুগ পরিবেশে, যখন ধর্মীয়, সামাজিক রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয়েছে আলোড়ন। বাংলা গদ্যের তথা উপন্যাসের আবির্ভাবের সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তাই উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব সম্পর্কেও আমাদের অবগত হওয়া প্রয়োজন।

খ. উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব

যুগানুগত্য উপন্যাস শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে বাংলায় সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি হয়নি। তাই উপন্যাসের উদ্ভবে উনবিংশ শতাব্দীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত বাংলা উপন্যাসের উন্মেষপর্বকে বুঝতে হ'লে উনবিংশ শতাব্দীর যুগবৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আমাদের অবগত হওয়া প্রয়োজন।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে চিন্তা চেতনা, জীবনবোধ, সাহিত্য - সর্বক্ষেত্রেই এক নূতন মূল্যবোধ আবিষ্কৃত হয়। বাংলায় নূতন যুগের সূচনা হয়। আত্মসচেতনতা, রাজনৈতিক

চেতনা, নূতন অর্থনৈতিক ও সেই সূত্রে সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস, জীবনদৃষ্টির ভিন্নতা ইত্যাদি বাংলার কালপ্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাকে প্রচন্ড ভাবে নাড়া দিয়েছিল - একে সংকীর্ণ অর্থে বলা যায় নবজাগরণ।[৩৩] এর পেছনে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবের কথা স্বীকার্য।

ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, ইতিহাস দর্শণ এবং সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশে 'যুক্তিমেয় সচেতন' জনমনে নূতন মূল্যকে আবিষ্কার করার তাগিদ অনুভূত হয়েছিল। এ হলো সচেতন বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসা। নানাবিধ সামাজিক কুপ্রথার সংস্কার সাধন করে, ধর্মের ব্যবহার উপযোগী ব্যাখ্যা প্রস্তুত করে, সমাজে ব্যক্তি মানুষের বিড়ম্বনা ও বঞ্চনার যে দীর্ঘ ইতিহাস গড়ে উঠেছিল, তার স্মৃতিকে মুছে ফেলে সার্বিকভাবে মানুষের বন্ধনমুক্তির উদ্যোগে শুরু হয়েছিল। মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছিল আত্মপ্রচার ও আত্মসম্প্রসারণের তাগিদ। আর এই তাগিদে প্রকাশিত হয়েছিল নানা ধরণের সংবাদপত্র, পুস্তক পুস্তিকা। গঠিত হয়েছিল নানা ধরণের সভাসমিতি, গ্রন্থাগার। সূচনা হয় মানুষকে সুমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার নবযজ্ঞ।

ব্যবসা, বানিজ্য, চাকুরির সুযোগ ও সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ কর্মমুখর হয়ে ওঠে। বস্তুজগতের সমস্ত প্রেরণা ও প্রাচুর্যকে আত্মস্থ করে, বিদ্যার সঙ্গে বিত্তের, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সহাবস্থান তখন শুরু হয়েছিল। এর ফলে মধ্যযুগের সামন্ত সমাজের গড়ণ ভাঙতে শুরু করে মধ্যযুগীয় শ্রেণী বিন্যাসেও পরিবর্তন দেখা দেয়। পুরাতন সমাজের গঠন ও শৃঙখলা ভেঙে নূতন সমাজ-শৃঙখলা ও শ্রেণী বিন্যাসের জন্ম হয়। এই নূতন শ্রেণীবিন্যাসের সময় সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণী (ধনিক শ্রেণী বা পুঁজিপতি শ্রেণী) মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আবির্ভাব হয়।[৩৪] এর আগে সমাজে যে ধনিকশ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ছিল না তা নয়। আসলে সেকালের শ্রেণীগুলির সঙ্গে একালের সমশ্রেণীভুক্তদের যে মৌল পার্থক্য ঘটে - সেটাই যুগান্তকারী। আর এই মৌলিক পার্থক্যের জন্যেই সমাজের রূপ বদলে যায়। মধ্যযুগে সামাজিক শ্রেণী বিচারের প্রধান মানদন্ড ছিল বংশ গৌরব বা রক্তের সম্পর্ক।

বংশানুযায়ী শ্রেণী মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকতো। সদাগর শ্রেণী, কারিগর শ্রেণী কিংবা অবস্থাপন্ন কৃষক শ্রেণী ধনসম্পত্তির দিক দিয়ে উচ্চশ্রেণীভুক্ত হবার যোগ্যতা লাভ করলেও এরা সেই শ্রেণীর মর্যাদা পেতো না। বংশ ও রক্ত সম্পর্কের অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে মধ্যযুগের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস সীমাবদ্ধ থাকায় সমাজের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী কাঠামো ছিল স্থিতিশীল।

নূতন শ্রমশিল্পের যুগে, ধনতন্ত্রের যুগে, সচল সক্রিয় যন্ত্রযুগে মধ্যযুগের সামাজিক অচলায়তন ভেঙে যায়। মধ্যযুগের দুর্ভেদ্য শ্রেণীপ্রাচীরও যায় ভেঙে। বংশ গৌরব কৌলীণ্য ও রক্ত সম্পর্কের আভিজাত্যকে জয় করে সচল সক্রিয় সর্বশক্তিমান মুদ্রা। উনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশে বুর্জোয়া শ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশ হয়। "শ্রমশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বণিক মুৎসুদ্দী দালাল জমি ব্যবসায়ী থেকে শিল্পোদ্যোগী পুঁজিপতি পর্যন্ত ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ হ'তে থাকে।"[১৫] আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ও প্রসারের ফলে নতুন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আর্বিভাব হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এখানে মনে রাখা দরকার ব্রিটিশ পুঁজিপতিশ্রেণীর একাধিপত্যের জন্য এবং ঔপনিবেশিক শোষণনীতির ফলে বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাভাবিক বিকাশ হয়নি। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান দর্শনের বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া দেশের বিশেষ করে সুদূর গ্রামের মানুষের মনে পৌঁছোয়নি। বাংলার নবজিজ্ঞাসার পীঠস্থান কলকাতা। ফলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা কিছু সংখ্যক বাঙালির কাছেই নূতন অর্থ বহন করে আনে।

ব্রিটিশ শাসকেরা আমাদের দেশের পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার অনেক কিছু ওলট পালট করেছেন। কিন্তু তার মূল গড়নটিকে অর্থাৎ বর্ণবৈষম্যের ভিত্তিকে একেবারেই আঘাত করতে পারেননি। ব্রিটিশ আমলে হিন্দু সমাজে কুলবৃত্তি ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যরা

কেউ জাতিচ্যুত হননি। বরং প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সমাজে তাদের কুলগত আধিপত্য আরও মজবুত করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৩৬] হিন্দু সমাজের এই ভিত আজ পর্যন্ত কোনো সংস্কারক অথবা কোনো শাসক ভাঙতে পারেননি। বৌদ্ধ জৈন হিন্দু মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান ইংরেজরা - কেউই ভাঙতে পারেননি। সংস্কারকদের মানবতার বাণী, রাষ্ট্রীয় আইনকানুন, শিক্ষার অগ্রগতি - ইত্যাদির ফলে তার গায়ে খানিকটা আঁচড় লেগেছে ঠিকই, কিন্তু ভিত্তিতে ফাটল ধরেনি। একথা যে কতোখানি সত্য বর্তমান শতকেও তা উপলব্ধি করা যায়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যরা টাকার ধান্ধায়, ব্যবসা বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হ'লেও, সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে তাদের কাছে শিক্ষা ও চাকুরীলব্ধ টাকার আকর্ষণ ছিল অনেক বেশি। সর্বোপরি, বাঙালি বণিকেরা (গন্ধবণিক, তাম্বুলি বণিক) ব্রিটিশ আমলেও কেউ আধুনিক শিল্পপতি হবার জন্য উদ্‌যোগী ছিলেন না। তারা তাদের বংশগত বাণিজ্যের গন্ডীর মধ্যে বন্দী হয়ে রইলেন। অবশ্য একথাও সত্যি যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীন বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের মুক্ত বিকাশ সম্ভব ছিল না। কিন্তু বাংলার অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে অন্তত শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্যবর্তী স্তরে সক্রিয় হয়ে উঠার সুযোগ ছিল। কিন্তু যথেষ্ট মূলধন সঞ্চয় করা সত্ত্বেও বাঙালিরা সে-পথে অগ্রসর হননি। নিষ্ক্রিয়তার প্রতিমূর্তি রূপে গ্রামের জমিদারী, শহরের গৃহসম্পত্তি, কোম্পানির কাগজ, স্বর্ণপিন্ড ইত্যাদিতে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ আয়ের সুযোগ খুঁজেছেন। আর এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সরকারী চাকরীকেই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। কিন্তু সমাজের অন্যান্য স্তরে এই সুযোগ অনুপস্থিত ছিল। বাংলাদেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ক্ষমতা-বিন্যাস (Power-structure) যৌথ পরিবার জাতিভেদ প্রথা, বিবাহ প্রথা, ধর্ম - ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (Social Institution) উপর প্রতিষ্ঠিত। উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারকদের যথেষ্ট প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এবং সংস্কার আন্দোলন মধ্যে মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করলেও, কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আমূল পরিবর্তন হয়নি। মূল অর্থনৈতিক গড়নের পরিবর্তন ছাড়া সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বিন্যাস (Institutional Power-structure)এর কোনো মৌলিক পরিবর্তন হ'তে পারেনা।

ফলে বাংলাদেশেও সেই কারণে বড় রকমের কোনো আর্থ সামাজিক পরিবর্তন হয়নি। আর তা হয়নি বলেই বাংলাদেশের রেনেসাঁস আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অনেক বাষ্প, বিদ্যুৎ ও বুদবুদ উদ্গার করেও এর পূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।[৩৭] তাই দেখা যায় বাংলার নব-জাগরণ মূলত মুষ্টিমেয় নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত 'এলিটের মস্তিষ্কের' আন্দোলন। ইউরোপীয়ান এলিটের আদর্শপুষ্ট হয়ে এদেশের শিক্ষিত এলিট গড়ে উঠেছিল। সেই আদর্শের বীজ থেকে অঙ্কুর, এবং অঙ্কুর থেকে গাছ ফল ফুল হবার মতো দেশের মানুষের মনের মাটি তৈরি হয়নি। এর কারণ তার উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ রচিত হয়নি। হিন্দু-সমাজের উচ্চস্তর থেকে, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের ধনিক ও সচ্ছল মধ্যবিত্তের স্তর থেকে আধুনিক বাঙালি এলিটের উদ্ভব। উনিশ শতকের বাঙালি এলিটকে এককথায় উচ্চবর্ণের সঙ্গতিপন্ন হিন্দু মধ্যবিত্ত 'এলিট' বলা যায়। এই শিক্ষিত এলিটশ্রেণীর সামাজিক উৎপত্তিও বাংলার নবজাগরণের প্রবাহকে কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তবুও মধ্যযুগীয় জীবনের স্থবির পিরামিডকে বিনষ্ট করে নবজাগরণ মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা দিয়েছে। নগর জীবনকে অবলম্বন করে, নগরের নূতন অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসে কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছে। মানুষকে বাস্তব উপযোগিতা সম্বন্ধেও করেছে সচেতন। এযুগ তাই নবচেতনার যুগ। নবজিজ্ঞাসার যুগ।

উনিশ শতকে বাংলার এই নবজিজ্ঞাসার পীঠস্থান হয়ে ওঠে কলকাতা। উনিশ শতকের প্রথমদিকেই বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে কলকাতা বিকশিত হ'লো। উনিশ শতকে এই বিকাশমান শহর কলকাতায় নানা ধরণের লোক এসে ভীড় জমাল। বাংলাদেশে এই আধুনিক নগরের প্রতিষ্ঠা ইংরেজ আগমনের পূর্বে হয়নি। ইংরেজ আগমনের পূর্বে গ্রাম আর গ্রাম্য জীবনই ছিল বাংলাদেশের সমস্ত কিছুর উৎস। শিক্ষা-দীক্ষা, বৃত্তি, পেশা সবই ছিল গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ব্রিটিশের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা স্থানান্তরিত হ'লে গ্রাম্য জীবনের স্থিতধী পিরামিডের স্তম্ভ এক এক করে ধ্বংস হ'তে শুরু করে। শিল্প বিপ্লবের ফলে নিজেদের দেশে

কলকারখানার সম্প্রসারণের প্রয়োজন বেশি করে অনুভব করে। এর ফলে এদেশীয় কৃষি ও কুটির শিল্পকে নিজেদের যোগানদার রূপে কাজে লাগায়। এই প্রয়োজনেই রাজসংক্রান্ত আইনের ঘন ঘন রূপান্তর, কুটির শিল্পের উপর যাত্রাধিক করারোপ শুরু হ'লো। এভাবে ইংরেজদের শোষণে কারুশিল্প ও কুটির শিল্প ধ্বংস হ'লো। তারপর ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বাংলার কৃষকের ও কৃষির চরম অবণতি ঘটে।[৩৮] এর ফলে গ্রামে কৃষি-কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল, তারা জমির স্বত্ত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। আবার কুটির শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল, তাদের ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তারা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়ায়। গ্রামের স্বনির্ভরতা ও স্বাচ্ছন্দ্যও ক্ষুন্ন হয়। গ্রাম বাংলার মধ্যযুগীয় সামাজিক অবস্থা ও সংস্কৃতি এই অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে বিপন্ন হয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ভারত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের বাজার গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় যানবাহন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। রেল-পথ নির্মাণে মূলধন নিয়োগ করেন। রেলপথ ও যানবাহনের প্রসারের ফলে খণ্ড, ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষ সংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়। সারা দেশের শাসন ও বাণিজ্যের কাজ কলকাতা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে। ক্রমে কলকাতা সমগ্রদেশের প্রাণকেন্দ্র রূপে পরিণত হয়। ভারতের পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে যাওয়ায় ভারতের বণিকশ্রেণী, ধনিকশ্রেণী সচেতন হ'য়ে ওঠে। ধনতান্ত্রিক যুগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তারা পুরাতন প্রাকারবেষ্টিত নগর ও আত্মকেন্দ্রিক গ্রাম্য সমাজের সংকীর্ণ সীমানা থেকে বেরিয়ে আসে কলকাতায়। নূতন বন্দর কলকাতা ধীরে ধীরে নগর কলকাতা হয়ে উঠে। বিকিকিনির হাট হয়ে উঠে রাজধানী।

কোম্পানির বানিজ্য ও শাসনব্যবস্থায় বাঙালি প্রথম এই নগর ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়, কলকাতা বাঙালির অর্থনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠায় গ্রাম বাংলা নগর কলকাতা অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করে। বস্তুত ধনী দরিদ্র, ছোট, বড় গ্রামীন মানুষের ভিড়েই কলকাতার

শহুরে সমাজ গড়ে উঠে। এই শহুরে বাতাসে গ্রামীন সংস্কার ও শাসনের বেড়াজালে বন্দী বাঙালি মুক্তির স্বাদ পায় এবং কলকাতায় প্রথম নগরোচিত এক 'বহুজাতি সমন্বিত' সমাজ ব্যবস্থার বীজ উপ্ত হয়। এই অদৃষ্টপূর্ব কসমোপলিটন সমাজ সংস্থিতি বাংলাদেশের নূতন সমাজ-বিন্যাসের ও নূতন সংস্কৃতির ভিত তৈরি করে। বস্তুত কলকাতাকে কেন্দ্র করেই আধুনিক বাঙালির উদ্ভব ও বিকাশ। নূতন যুগের নূতন সংস্কৃতির পীঠস্থান রূপে কলকাতা আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরও পীঠস্থান হয়ে উঠে। সাহিত্য দেশকালের পরিস্থিতি ও প্রত্যাশার বিরুদ্ধতা করেনা, ফলে মানুষের বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হ'লো নূতন সাহিত্যের। যেখানে মানুষের মহিমাকেই সগৌরবে ঘোষণা করা হয়। আপ্তবাক্য নয়, যুক্তিনিষ্ঠাই এর অবলম্বন। এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণার বশেই উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য নূতন প্রাণপ্রাচুর্য ও সম্ভাবনা নিয়ে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'তে থাকে। এই প্রেরণা মূলতঃ পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা সম্ভোগের ফল। বলাবাহুল্য নবজাগরণের ফলশ্রুতি।

ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের নবজাগরণ সম্পর্কিত আলোচনা থেকে উনিশ শতকের বিশেষত্ব হিসেবে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো আমরা সূত্রবদ্ধ করতে পারি ——

১) জীবনে গতিশীলতার স্বীকৃতি। কূপমন্ডূকতার পরিবর্তে জীবনের বিচিত্র অভিযানের বাসনা।

২) বর্হিবিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে জ্ঞানের প্রসার। ধর্মীয় অনুশাসনের সঙ্গে কালের স্রোতে যে সমস্ত সামাজিক সংস্কার ও কুপ্রথা ছিল, নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে সেগুলোর পুনর্বিবেচনার আগ্রহ উনিশ শতকের অন্যতম বিশেষত্ব। এর ফলে বুদ্ধি ও যুক্তির মানদন্ডে জীবন ও জীবনের ওপর বহমান ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধে উৎসুক্য দেখা দেয়। তার সঙ্গে দেখা দেয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার। জাতীয় জীবনে গতি সঞ্চারের জন্য জাগে সমাজ সংস্কারের বাসনা।

৩) মানুষের অদম্য উৎসাহ, তৎপরতা ও সৃজনশক্তির ওপর আস্থা উনিশ শতকের যুগবৈশিষ্ট্য। এর ফলে জাগে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ। ব্যক্তি চিত্তার সঙ্গে সমাজবিধৃত

ব্যক্তির স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস সমাজচেতনার অবশ্যম্ভাবী ফল। ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠীভাবনার পরিবর্তে জাতিগত গোষ্ঠীভাবনার জাগরণ ঘটে।

৪) জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি ও কর্মের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠার নূতন পথের আবিষ্কার। নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন। সুস্থ শক্তিশালী পরিবার তথা সামগ্রিক সামাজিক উন্নতিবিধানে নারীর অপরিহার্যতার স্বীকৃতি। সভাসমিতি গঠনের মাধ্যমে আত্মসমালোচনা, আত্মসমীক্ষা ও আত্ম-প্রকাশের তৎপরতা, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

৫) মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে পুস্তক ও পত্রিকার প্রকাশ। সৃজনশীল প্রতিভার মাধ্যমে শিল্পসাহিত্যে ঘটে নূতন নূতন ধারার বিকাশ।

পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালি মানস এক নূতন জীবনবোধের সন্ধান পায়। ক্রমান্বয়ে তা বাঙালির জীবনচর্চার অনিবার্য উপাদানে পরিণত হয়। তারপর এই উপাদানকে আত্মস্থ করে বাঙালি নবজীবনবোধকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। এর ফলে দীর্ঘদিন যে সমস্ত প্রথা বা নিয়মে জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, জীবনের চলা নির্ধারিত হয়েছে - বর্তমানের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে সেগুলির পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রয়াস জাগে। বাঙালি মন ও মনন প্রাচীনচিন্তাকে তখন আর হুবহু গ্রহণ করতে সম্মত নয়। যে মানুষকে সবসময় ধর্ম দিয়ে, সমাজ দিয়ে, অনুশাসন দিয়ে বন্দী করে রাখা হ'তো উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হ'লো সেই মানুষের বন্দীমুক্তির প্রয়াস। নূতনচেতনার উন্মেষে বাঙালির মধ্যে জাগে সংস্কার বাসনা। এই সংস্কার আসলে শিক্ষার সংস্কার।

মধ্যযুগে বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে টোল, চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত, পুরাণ, ন্যায়, তন্ত্র, স্মৃতি, আরবী, পারসী শিক্ষা দেওয়া হ'তো। আর এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মনে ধর্মবোধকে জাগিয়ে তোলা। মূলতঃ এই শিক্ষায় মনুষের ইহজাগতিক কল্যাণ, মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধিকার, কোনো

কিছুই প্রাধান্য পেতো না। কিন্তু উনিশ শতকে শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হ'য়ে গেলো।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল হিন্দুস্কুল (১৮১৭), স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), স্কুল সোসাইটি (১৮১৮)। সরকারী আনুকূল্যের উপর নির্ভর না করে দেশী বিদেশী শিক্ষানুরাগীদের সহায়তায় ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি পাশ্চাত্ত্যসাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শণ, গণিত প্রভৃতি ব্যবহারিক বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষান্দোলনের ইতিহাসে একটা নূতন যুগের সূচনা করে।[৩১] হিন্দুস্কুলের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের বন্ধনমুক্তি। এখান থেকেই শিক্ষাকে মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের উপর স্থাপন করার চেষ্টা শুরু। শিক্ষা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মকে পৃথক করে রাখা হ'লো। আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রসারের তাগিদে গড়ে উঠে নানা সভাসমিতি। প্রকাশিত হয় নানান ধরণের পত্র-পত্রিকা। আধুনিক শিক্ষার অন্যতম সুফল স্ত্রীশিক্ষার প্রসার। জীবনকে সুন্দরভাবে গড়তে হ'লে, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতির স্বার্থে, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয়। এ ব্যাপারে এগিয়ে এলেন দেশী বিদেশী বহুসমাজসেবী ও বিদ্যানুরাগী মহানুভব ব্যক্তি। নূতন শিক্ষাই বাঙালিকে সুন্দরজীবনের প্রত্যাশায় ধর্মসংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্মসংস্কারের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে রামমোহন রায় 'আত্মীয়সভা'(১৮১৫) প্রতিষ্ঠা করেন। এই চিন্তারই চূড়ান্তরূপ ব্রাহ্মসমাজ(১৮২৮)।

বাংলাদেশের সমাজচেতনা ধর্মচেতনার পরিপূরক হয়েই দীর্ঘদিন লালিত হয়েছে। বাঙালির জীবনবোধকে আবিষ্কার করতে গেলে ধর্ম থেকে সমাজকে, অথবা সমাজ থেকে ধর্মকে পৃথক করা যাবেনা। কেননা ধর্মীয় প্রথা ও অনুশাসনের প্রয়োগস্থলই ছিল বাঙালির সমাজজীবন। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, সতীদাহপ্রথা, কৌলীণ্যপ্রথা, বৈধব্যপ্রথা - এ সমস্তই তখন ধর্মের নির্দেশে পালন করা হ'তো। এসব প্রথার বিষময় ফল নারী সমাজকেই ভোগ করতে হয়েছে।

অবশ্য এর ফলে শুধু নারী সমাজই বঞ্চিত হয়নি, বঞ্চিত হয়েছে গোটা বাঙালি সমাজ। সেজন্য ঊনিশ শতকে শিক্ষা ও ধর্মসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বাঙালি যে অনুভব করেছিল, তার মধ্যেই বীজাকারে সমাজসংস্কার বাসনা আত্মগোপন করেছিল। প্রচলিত প্রথাগুলো যে সমাজের অনিষ্ট ও অমঙ্গলের কারণ এ চেতনা তখন সমাজে সঞ্চারিত হয়েছিল।

ঊনিশ শতকের পূর্বে বাংলাদেশে এমন কোনো সভাসমিতি সংগঠন ছিল না যেখানে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে জীবনের সমস্যাবলী নিয়ে একত্রিত হ'তে পারে। তখনকার জীবন পরিচালিত হয়েছে ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীতন্ত্রের দ্বারা। সেখানে স্বাধীনমতের বা মুক্তচিন্তার কোনো সুযোগ ছিল না। ধর্মকে ঘিরেই মানুষ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ আবর্তিত হ'তো। কিন্তু ঊনিশ শতকে ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠীতন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালি জীবন-ভিত্তিক গোষ্ঠীবাদের সাধনা শুরু করে। সভা সমিতি স্থাপনের মাধ্যমে বিচিত্র বিষয়, বিচিত্র শ্রেণী, বিচিত্র মন, বুদ্ধি ও চিন্তার সহাবস্থান ঘটে। আলাপ-আলোচনা-বিচার বিশ্লেষণ বিতর্কের মাধ্যমে একটা গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। তাই দেখা যায় ধনতন্ত্রের প্রসারে ও পাশ্চাত্য জীবনবোধের সংস্পর্শে, হিতবাদী জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার সূত্র ধরে বাঙালি সমাজে নারীপুরুষ নির্বিশেষে মানুষের প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসে। মধ্যযুগীয় গোষ্ঠীতন্ত্রের আওতা থেকে ব্যক্তি মানুষকে মুক্ত করে। ব্যক্তি মানুষের একক অনুভব, উপলব্ধি, কামনা, বাসনা, স্বতন্ত্র মর্যাদা পায়।

উপন্যাসের প্রথম ও প্রধান অন্বিষ্ট হ'লো সমাজ পরিবেশ বিধৃত মানুষ। কাজেই দেখা যাচ্ছে ঊনিশ শতকেই উপন্যাসের প্রাথমিক শর্ত পূর্ণ হয়। ক্রমে ঊনিশ শতকের নব জাগ্রত মানুষের সমাজচেতনা সমকালীন সাহিত্যে সঞ্চারিত হয়। সাহিত্যও মানবীয় হয়ে উঠে। সূচনা হয় আধুনিক যুগের। এবং আধুনিক সাহিত্যের। আর এই আধুনিক যুগের ও আধুনিক সাহিত্যের সক্রিয় প্রগতিশীল শক্তি হলো নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজ। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এদেশের ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যতো পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয়েছে তার মূলে নিহিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সক্রিয় প্রচেষ্টা।

গ. ইংরেজি শিক্ষা ও বাংলার জাগরণ : মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব, পাঠক সমাজ সৃষ্টি

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোকে উনিশ শতকে বাঙালির মনের আগল ঘুচে যায়। বাঙালির জীবন থেকে মধ্যযুগ স্খলিত হয়ে পড়ে। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে উদ্ভূত বাঙালির 'নবজীবনবোধ' বাংলা সাহিত্যেও বিকশিত হতে আরম্ভ করে। প্রশাসন, বিচার ও ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্রিটিশ শাসকদের কিছু অধস্তন কর্মচারী, করনিক ও পেশাদার মানুষের প্রয়োজন ছিল। ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই শ্রেণীর জন্ম দেওয়া। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে নবজাগ্রত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক যোগাযোগের ফলে তারাই সর্বপ্রথম ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে ব্রিটিশ প্রশাসনের সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে সারাভারতে বাঙালিরা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়েছে। উদ্যোগী ইংরেজ যেমন বাঙালিদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তেমনি ইংরেজি শিক্ষা বাংলা সাহিত্যকেও করেছে অনুপ্রাণিত। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্ত্য জীবনদর্শণ বাঙালি জীবনে নূতন আলো দান করে। নূতন জীবন দৃষ্টি দান করে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় মর্তপ্রীতি, মানব ও জীবনপ্রীতির সবিশেষ প্রাধান্য ছিল। "একদিকে পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের দুর্দমনীয়তা, প্রাণপ্রাচুর্য ও গতিশীলতা এবং নবীন ইউরোপের চমকপ্রদ ঘটনাবলী, অপরদিকে আমাদের মধ্যযুগীয় অচল অবস্থা - এই দুয়ের মাঝখানে পড়ে একালের উৎসাহী বাঙালি ইংরেজী শিক্ষালাভে তৎপর হয়।" [৪০] পাশ্চাত্ত্যের বস্তুতান্ত্রিক ও জীবনধর্মী শিক্ষার কল্যাণে বাঙালির সামাজিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পরবর্তী স্তরে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন সমূহ দানা বাঁধে। বাঙালি নারীর মুক্তির সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অনেক ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিই ইংরেজিতে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। এঁরা ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রজন্মের ছাত্র।[৪১] সাহিত্য সৃষ্টির যে নূতন প্রাণস্পন্দন একদিন ইংরেজি রচনার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা বাংলা রচনায় সঞ্চারিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বিভিন্ন শিল্পশৈলীর অনুকরণ এবং তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নবীকরণ ঘটেছে। ডিরোজিও চেতনা-প্রসূত মানবিক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে মধুসূদন মানুষকে দেবতা করার পরিবর্তে রাক্ষসদের মনুষ্যপদে উন্নীত করেন। নূতন জীবনবোধ সঞ্জাত চেতনার রঙে কবি বাঙালির রাধাচেতনাকে ব্যক্তিক রাধায় রূপান্তরিত করেন। সাহিত্যে কল্পনার উজ্জীবন যেমন প্রধানত কাব্যের মাধ্যমে ঘটে, তেমনি চিন্তার উজ্জীবন ঘটে মূলত গদ্যের মাধ্যমে। ইংরেজিসাহিত্যের প্রভাবে বাঙালির চিন্তাজগতে যে বিস্ময়কর আলোড়ন উনিশ শতকে দেখা দিয়েছিল, তার পরিচয় বাংলা গদ্য-রচনায় নিহিত। প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজি সাহিত্যের প্রকৃষ্ট ভাবসমূহ বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতিতে সহায়ক হয়েছে।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিদ্যায়তনের জন্য পাশ্চাত্ত্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস অনুসরণে বিভিন্ন ধরণের পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদে নবযুগের বাঙালি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ পায় এবং বাংলা গদ্যে সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করে। উনিশ শতকের গোড়ায় অবশ্য ইংরেজি সাহিত্য নয়, ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতিই বাঙালির প্রবণতা ছিল বেশি। বস্তুত প্রথমদিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কাজ চালাবার মতো ইংরেজি ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হ'তো। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার পর এই কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি সাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগ লাভ করে। অন্যান্য বিদ্যায়তনেও ক্রমশ ইংরেজি সাহিত্যের পঠন পাঠনের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য পাঠের অধ্যয়ন সম্প্রসারিত হয় দুভাবে। ক) স্কুল ও কলেজের পাঠ্য হিসেবে এবং খ) পাঠ্যবর্হিভূত বিষয় হিসেবে। এই সূত্রেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ অথবা দার্শনিক গ্রন্থ পাঠের একটা প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছিল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে জ্ঞানচর্চার ও জীবনকে বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করার প্রেরণা থেকেই বিদেশী গ্রন্থ পাঠে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা তখনও পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষিত মনের উপযোগী কোনো বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়নি। বাংলা গদ্যের গঠনশৈলীও তখন সাবলীল হয়ে উঠেনি। তাই লেখায় এবং পাঠে ইংরেজি গ্রন্থের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য —

> মিল, বেন্থাম, বেকন, টমাস, পেইন, ম্যাটাসিনি, ডিফো, ফিল্ডিং, রিচার্ডসন, স্কট, বায়রণ, ডিফেন্স ইত্যাদি লেখকদের রচনা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীরভাবে অনুরাগের সংস্কার করেছিল।[৪২]

তবে তা শুধু পঠন-পাঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে আকর্ষণের ফলে বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদের একটা প্রবণতাও সে যুগে তীব্রতর হয়েছিল। জ্ঞানানুভূতি ও রসানুভূতির চরম উৎকর্ষকে সে সময়ে বাঙালি অনুবাদ অথবা অনুকরণ বা অনুসরণের মাধ্যমে চরিতার্থ করতে চেয়েছিল।

উপন্যাস রচনার পেছনে থাকে একটা সুপরিকল্পিত শিল্পভাবনা। যেহেতু আধুনিক-কালে উপন্যাসের জন্ম, তাই বলতে হয়, উনিশ শতকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতির ফলে বাঙালির মানসিক ভূগোলের পরিবর্তন অনিবার্য হয়েছিল। এই সূত্রেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ও সম্ভোগের সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। আর এর মাধ্যমেই বাঙালির সৃজন-শীল প্রতিভা পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে বাংলা উপন্যাস রচনায় আগ্রহী হয়েছে। তাই গদ্য মাধ্যমকে অবলম্বন করে বাংলাদেশে যখন প্রথম বৃহদাকার গল্পকাহিনী রচনার প্রবণতা তীব্রতর হয়েছিল তার পেছনে পাশ্চাত্ত্যসাহিত্য বিশেষত পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস পাঠের একটা প্রভাব ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[৪৩]

সাহিত্যের সঙ্গে দেশীয় সমাজ ও অর্থনীতির সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। কোনো দেশের সাহিত্যে তখন কোনো বিবর্তন বা নূতনত্ব অনিবার্য হয়ে উঠে, তখন তার পেছনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধান করা যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্র-প্রস্তুতির ইতিহাস অনুধাবণ করতে গিয়ে তাই সমসাময়িক বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক পরিচয় উদ্‌ঘাটনও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আমরা আগেই বলেছি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোকে, নবজাগরণের ফলস্বরূপ মধ্যযুগীয় সামাজিক গড়ন ভেঙ্গে যায়। বংশকৌলীন্যের স্থানে বিত্তকৌলীন্যের সূচনা হয়। বস্তুত ঔপনিবেশিক অর্থনীতির দ্বারা সমকালীন জীবনবোধ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বাণিজ্যের মুনাফালব্ধবিত্ত এবং বিদ্যার্জিত বিত্ত নূতন সমাজে দুয়েরই সমমর্যাদা। ব্রাহ্মণ সন্তান বাণিজ্য করে বিত্তবান হ'তে পারে, আবার বণিকের সন্তানও বিদ্যাচর্চা করে বিত্তশালী পন্ডিত হ'তে পারে। কারো সামাজিক প্রতিষ্ঠার পথে কোনো বাধা নেই। এটা মধ্যযুগে ছিল অসম্ভব। বিত্তের মর্যাদা মধ্যযুগেও ছিল। কিন্তু ব্যক্তি-সামর্থের সঙ্গে তার যোগ ছিল না। এই স্বীকৃতি নবযুগের।

ঔপনিবেশিক সমাজে অবাধ বাণিজ্যে মুনাফা সঞ্চয় করে যাঁরা বিত্তশালী হ'লেন, 'সমাজশাস্ত্রের' ভাষায় তারা বুর্জোয়া শ্রেণী। আর বিদ্যাবুদ্ধি খাটিয়ে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জনে সফল হ'লেন তাঁরা হ'লেন 'বুদ্ধিজীবী' শ্রেণী। এই নূতন সামাজিক শ্রেণীকে সাধারণভাবে 'নবযুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণী' বলা যায়। বিত্তবান ও বিদ্বান সকলেই মধ্যবিত্তের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারেন।[৪৪] এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবই সর্বত্র মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের ইঙ্গিত বহন করে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক পোলার্ডের উক্তি স্মরণীয় —— "...where you had no middle class; you had no Renaissance and no Reformation."[৪৫]

এই মধ্যবিত্তরাই নূতন যুগের আলোয় জীবনকে অভিষিক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। জীবনের গতানুগতিকতা দূর করে জাতির জীবনে এনেছিল নূতন প্রাণস্পন্দন। এঁরা অনুসন্ধিৎসু, সমাজ সচেতন এবং আপন ব্যক্তিত্বে আস্থাবান। সমাজের শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে এঁরা যুক্ত। আপন স্বাতন্ত্র্যে এঁরা উজ্জ্বল। এঁদের মিলনস্থল হ'লো নূতন গড়ে উঠা শহর কলকাতা।

বাংলাদেশে নবযুগের প্রবর্তক এই নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণী। নবযুগের সচেতন মধ্যবিত্ত জনমানস নিজেদের স্বার্থে ইংরেজকে ও সেই সূত্রে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিকে মোটামুটি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছিল।[৪৬] নাম না জানা সাগর পারের বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক এদেশের তরুণদের সামনে এক অজানা জগতের স্বাদ এনে দেয়। বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ও দৈন্যের পাশে ইংরেজি সাহিত্যের নবীনতা বাঙালিকে আকৃষ্ট করে। শেক্সপীয়র, বায়রন, স্কট, মিলটন, কাউপার, পোপ ডাইড্রেন এঁরা নব্যশিক্ষিত বাঙালি তরুণদের প্রেরণাস্থল হয়ে উঠলেন। রামায়ণ মহাভারতের স্থান নিল ইলিয়াড, ওডিসি। মধুসূদন, এবং আরো অনেক শিক্ষিত বাঙালি যুবক ইংরেজিকেই প্রাণের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁরা স্বপ্নও দেখতে আরম্ভ করেন ইংরেজিতে। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য প্রীতির পেছনে ইংরেজি শিক্ষিতের উজ্জ্বল সামাজিক ও আর্থিক ভবিষ্যতের প্রলোভনও যুক্ত হয়ে ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় কিশোরী চাঁদ মিত্রের ১৮৪৫-এ 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ প্রকাশিত 'রামমোহন রায়' সম্পর্কিত ইংরেজি লেখাটি তাঁর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদপ্রাপ্তির সহায়ক হয়েছিল।[৪৭]

মোটকথা, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাবে স্বদেশের দীনতার মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আর তারই ফল হয়েছিল সর্বত্র এক ব্যাপক সংস্কার আন্দোলনের উদ্যোগ। প্রকৃতপক্ষে " বাংলাদেশে নবযুগের ধর্মসংস্কার, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি যে প্রধানত মধ্যবিত্তেরই কীর্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই।" [৪৮] উনিশ শতকের গোড়া থেকে শুরু করে বর্তমান শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালির উল্লেখযোগ্য যুগান্তকারী সমস্ত কাজের মূলে রয়েছে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবদান। আরো স্পষ্ট করে বললে আধুনিক বাংলা, তার সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্য সমস্তই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবদান। বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনের পুরোধাও এই নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী।

মধ্যযুগে সাহিত্যের লালনক্ষেত্র ছিল রাজদরবার। নগর জীবনের বিকাশে, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণে, মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে রাজদরবারের বদলে কলকাতায় বড় মানুষের

বৈঠকখানা হয় আধুনিক সাহিত্যের লালনস্থল। বস্তুত রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে, গণ-তান্ত্রিক চেতনার স্ফুরণে সাহিত্য রাজসভা থেকে জনসভায় স্থানান্তরিত হয়। আর এই সাহিত্য-চর্চার যথার্থ দায়িত্ব এসে পড়ে নগরাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে। তাদের চেতনায় সাহিত্যও হয়ে ওঠে মানব জীবনাশ্রয়ী।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চেতনার প্রশান্তি মেলে পঠন-পাঠনে। গ্রামের চণ্ডী-মণ্ডপের শ্রোতৃসমাজ কলকাতার নূতন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকার পাঠক সমাজে রূপান্তরিত হয়। শিক্ষিত সমাজের জাগ্রত মনন ও অনুভূতির আশ্রয়স্থল হয় বিভিন্ন গ্রন্থ। বস্তুত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যপাঠে বাঙালির আত্মমর্যাদাবোধ দানা বাঁধে। আর সেখান থেকেই নিজেদের জীবন ও সমাজকে ভারমুক্ত করার প্রেরণা জাগে।

পাশ্চাত্ত্য ধ্যান, ধারণা চিন্তা-চেতনা সংঘাত সংঘর্ষে উনিশ শতকে বাঙালির নব-জাগ্রত জীবনবোধ শুধু সমাজেই নয়, সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। রামমোহন কর্তৃক আত্মীয় সভার প্রতিষ্ঠা(১৮১৫ খ্রীঃ) সুপরিকল্পিত সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তারই প্রতিফলন। সেখানে সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, কৌলীণ্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করা হ'তো। এ সমস্ত প্রথার অন্তঃসারশূন্যতা গভীরভাবে অনুভব করেছিল মধ্যবিত্তশ্রেণী। এর প্রমান ছড়িয়ে রয়েছে সমকালে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সভা সংগঠনের বক্তব্যে, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ সমস্ত পত্র পত্রিকা পঠনপাঠনের মাধ্যমে চরিতার্থ করেছে নিজেদের কৌতূহলী পিপাসাকে। ক্রমশ: পাঠকসমাজের সংখ্যা ক্রমবর্ধিত হয়। আর এই নূতন পড়ুয়ারা সাধারণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়ে তৃপ্ত হচ্ছিল না।[৪১]

এই যুগের প্রধান কথা ইহলোকমুখী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা। মানবতাবিরোধী প্রাচীন সংস্কার ও ধারণার বর্জন। যুক্তিবাদ বরণ আর প্রাচীন ভারতীয়

শাস্ত্রের ও সাহিত্যের নবমূল্যায়ন। বলাবাহুল্য এ হ'লো সংকীর্ণ অর্থে হলেও বাংলার নব-জাগরণের ফলশ্রুতি। তাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু স্বাভাবিক-ভাবেই মননশীলতা, জ্ঞানৈষণা, সংস্কার প্রচেষ্টা, ব্যঙ্গপ্রিয়তা, সমসাময়িকতা। এই বহুগামী চেতনারই অন্যতম পরিণাম নূতন যুগের নূতন মূল্যবোধ - নারীব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি। যার পরিণাম সতীদাহ প্রথা রোধ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন বা বহুবিবাহ রোধ আন্দোলন। সামাজিক ভাবনা যে কোনো দেশের মতোই উনিশ শতকের বাংলাদেশের সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছিল।

নবজাগরণের অন্যতম অবদান নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে নূতনবোধ এবং নারীভাবনা সম্পর্কে নূতন দৃষ্টির প্রকাশ।

> বিধবার পুনর্বিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন, বহুবিবাহ ও কৌলীণ্য সম্পর্কে সমাজের এক শ্রেণীর বিরূপতা, স্ত্রীশিক্ষা ও নারীর ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ সম্পর্কে দ্রুতপরিবর্তনশীল আগ্রহ, নারী ভাবনার বিচিত্র কৌলিকতা সাহিত্যে নারীর ভাবমূর্তি নির্মাণে পরোক্ষ ভাবে প্রায়শই উদ্দীপকের কাজ করে যাচ্ছিল।[৫০]

সব মিলিয়ে এই নবোদিত সমাজচেতনা উনিশ শতকে সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠী বাদ-প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। অচলায়তনও ভাঙতে আরম্ভ করে। এই পর্বে বাঙালি যেন জীবনকে পুনর্গঠন করতে প্রয়াসী। এ পর্ব বাঙালির আত্মরক্ষার এবং আত্ম আবিষ্কারের পর্ব।[৫১] রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্র-নাথ, বিদ্যাসাগর, প্রমুখ ব্যক্তিদের মননশীল, ঐতিহাসিক, যুক্তিবাদী রচনায় নিহিত সম-কালীন জীবনাগ্রহ। বিচিত্র পঠন পাঠনের মাধ্যমে মানুষ তখন সমাজ ও সমাজবিধৃত মানুষকে অন্বেষণ করছে। এই পাঠক সমাজের কৌতূহলের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং বাংলাদেশের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উপন্যাস রচনার একটা প্রস্তুতিপর্বের সূচনা হয় তখন। এর পরিচয় নিহিত প্রাক্‌বঙ্কিমপর্বের রচনায়। তবে তার আগে আমাদের মনে রাখা দরকার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালির যে চিত্তচাঞ্চল্য ও চিত্তজাগরণ দেখা দিয়েছিল তার ফলস্বরূপ আত্মপ্রকাশ ঘটে অসংখ্য পত্র পত্রিকায়। সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম নিয়ে নানা আলোড়ন আন্দোলন

সংবাদপত্রের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক অন্বয়ের ফলে সংবাদ সাময়িকপত্রে বাংলা গদ্যের একটি সম্মতরূপ গড়ে উঠার প্রচেষ্টা চলে। আর এই সম্মতরূপের অন্বেষণের ফলেই চল্লিশের দশক থেকে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের হাতে বাংলা গদ্য বঙ্কিমচন্দ্রের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠতে থাকে।[৫২] ফলে উপন্যাসের ক্ষেত্রপ্রস্তুতির ইতিহাসে বাংলা সাময়িকপত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বাংলা উপন্যাসের উন্মেষপর্বকে বুঝতে হ'লে বাংলা সাময়িকপত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অবগত হওয়া প্রয়োজন।

ঘ. সাহিত্য ও সাময়িকপত্র

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে সংস্কার সাধনে উৎসাহী বাঙালির চিত্তচাঞ্চল্য সমাজে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি করে। বাঙালির এই জাগ্রত ব্যাকুলতার মাধ্যম হয়েই সেকালে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে অসংখ্য পত্র পত্রিকার। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তক রচনার মাধ্যমে গদ্যচর্চা আরম্ভ হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক বর্হিভূত গদ্যচর্চার আরম্ভ হয়। জাতি হিসেবে কোনো জনগোষ্ঠীর ধ্যান ধারণা, চিন্তা চেতনা কোন পথে বিবর্তিত হয় - পত্রপত্রিকায় তা আত্মপ্রকাশ করে। সংবাদপত্র তাই জাতির অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। উনিশ শতকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বাদানুবাদ সমকালীন পত্রপত্রিকা গুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই গদ্যকে সরস করে তোলারও একটা প্রচেষ্টা লেখকদের ছিল। সাময়িকপত্রের গদ্যই তাই প্রথম সামাজিক গদ্য যেখানে বিনিময়ের ও সংগঠনের দায়িত্ব গদ্যকে মেনে নিতে হয়েছিল। সংবাদ-সাময়িকপত্রেই আমরা পরিমানগতভাবে সেই বিপুল গদ্যরচনা পাই, যার সাক্ষ্যে বাংলা গদ্যের বিকাশের চিহ্ন-গুলো সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারে।[৫৩] পত্রপত্রিকার মাধ্যমেই বাংলা গদ্যসাহিত্য বস্তু-নিষ্ঠ ও সমাজনিষ্ঠ হয়ে উঠে। সংবাদপত্র ও সাহিত্যের যোগ তাই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

সংবাদসাময়িকপত্রের গদ্যে প্রধান দায় জনসংযোগের দায়। সিবিলিয়ানদের বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা বা মিশনারিদের বাইবেল অনুবাদের বাংলা গদ্যের দায়দায়িত্ব সে তুলনায় সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলা সংবাদসাময়িকপত্র এমনি এক সময় প্রকাশিত হ'তে শুরু করে যখন শিক্ষা, রুচি ও আর্থিক ক্ষমতার নিরিখে কলকাতাবাসী বাঙালি জনসমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা যায়না অথচ সেই বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হওয়ার প্রবণতা সেই জনসমাজে স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। এই রকম একটি অসংগঠিত নাগরিক সমাজে সম্ভাব্য পাঠকমণ্ডলীর শিক্ষা, রুচি, ভাষা ও ঐতিহ্যে গদ্যভাষার আদর্শ সন্ধানের সুযোগ থেকে বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র প্রথম থেকেই বঞ্চিত। অন্যদিকে কোম্পানির ব্যবসাবাণিজ্য ও সরকারী বিধিব্যবস্থার জন্য বাংলা-ভাষার ব্যবহার যোগ্য শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গিও সংবাদসাময়িকপত্রগুলিতে আবিষ্কার করে যেতে হয়েছিল। এইভাবে দৈনন্দিন বাঙালি জীবনের অংশ হয়ে উঠার চেষ্টাতেই সংবাদ সাময়িক-পত্রের পাতায়-পাতায় বাংলা গদ্য ভাষার জন্ম হয়ে যাচ্ছিল।[৫৪]

প্রাত্যহিক প্রয়োজনে সর্বকাজে গদ্যকে নিয়োগ সাময়িকপত্রের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি।

> গদ্যসাহিত্যে সাহিত্যিক গদ্যে পৌঁছাতে গেলে মাঝখানে সাময়িকপত্র ও সংবাদ-পত্রের যুগকে অতিক্রম করতে বাধ্য হয়, ওটা একেবারেই অপরিহার্য্য। ওতে গদ্যসাহিত্যের নমনীয়তা বাড়ে, শব্দভাণ্ডার বাড়ে, সর্বকাজে ব্যবহারযোগ্যতা বাড়ে, আর সেই সঙ্গে বাড়ে সর্বজনের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা। এই শক্তি অর্জিত না হওয়া অবধি গদ্য সাহিত্য সাহিত্যিক গদ্যে পরিণত হ'তে পারেনা।[৫৫]

লক্ষণীয় যাঁরা বাংলা গদ্য পড়তে আগ্রহী ছিলেন, যাঁরা বাংলাগদ্যকে পরিণত রূপ দিয়েছেন, তারা সবাই সাময়িকপত্র বা সংবাদপত্র রচনার জন্যেই কলম ধরছেন। সংবাদপত্রই তাঁদের আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন। প্রথম দিকে বিভিন্ন ধর্মীয় বিতর্কের সর্পিল পথে বাংলা গদ্যের

যাত্রা শুরু হয়। ক্রমশ: পরিবর্তনমুখী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে সামাজিক আন্দোলনের ফলে তা জীবনরসে স্পন্দিত হয়ে উঠে। এবং বাঙালি জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনা মনোরমভাবে পরিবেশিত হ'তে থাকে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলাসাময়িকপত্র বিষয়ক গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকানুযায়ী ১৮১৮ থেকে ১৮৫৫ এর মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা ১৩৮। আমরা এর সবগুলোর উল্লেখ না করে বাংলাগদ্যের উদ্ভবে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকটি পত্রিকার দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পত্রিকা দিগ্‌দর্শন (১৮১৮, এপ্রিল)। এর সম্পাদক ছিলেন মার্সম্যান। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এটি প্রকাশ করেন। এর পর থেকেই শুরু হয়েছে নানা বৈচিত্র্য ও বাধাবিপত্তির মাধ্যমে সাময়িকপত্রের ক্রমবিকাশ। দিগদর্শণে প্রধানত শিক্ষা-মূলক রচনাই বের হ'তো। কম্পাস, বেলুন, বাষ্পীয় জাহাজ, ভারতের গাছপালা, প্রাচীন ও নূতন জাতিদের ইতিহাস, ভ্রমণ বিবরণ, ভূগোলের নানা তথ্য, ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য - এই সমস্ত বিষয়েই রচনা প্রকাশিত হ'তো।[৫৬] স্কুল বুক সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে পত্রিকাটি পাঠ্যপুস্তক রূপে চালু ছিল। তবে কৌতুককর অথবা বিস্ময়কর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীও প্রকাশিত হ'তো।[৫৭] দিগদর্শনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশ করেন।

সমাচার দর্পণ(১৮১৮, মে) এটি বাংলা সাময়িকপত্রের প্রথম স্মরণীয় নিদর্শণ। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ক্লার্ক মার্শম্যান। তবে দেশীয় পন্ডিতেরাই পত্রিকাটি প্রকাশের প্রধান সহায়ক হয়েছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রথম অবস্থায় 'সমাচারদর্পণের সম্পাদনায় সহায়তা করেছিলেন। তারিণীচরণ শিরোমণিও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে-ছিলেন। পত্রিকাটিতে সমসাময়িক বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম - ইত্যাদি সর্বমুখী বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হ'তো। সমাচার দর্পণের পৃষ্ঠাতেই নারী-শিক্ষা, সতীদাহ নিবারণ চেষ্টা প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক আন্দোলনের পরিচয় মেলে।

কলকাতার নাগরিক বাঙালিদের কাছে বাংলা ভাষায় বৃহত্তর ভারতবর্ষ ও বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিত দর্পণের মধ্য দিয়ে পরিচিত হয়ে ওঠে।[৫৮] তবে মিশনারীদের পরিচালিত বলে মাঝে মাঝে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের গ্লানিসূচক লেখাও বের হ'তো। বাঙালি সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা সমাচার দর্পণের গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৃদ্ধের বহুবিবাহ, কুলীনের বহুবিবাহ, ঘটকের কারসাজি, বিবাহের অছিলায় প্রবঞ্চনা, পুরোহিতদের কীর্তিকাহিনী দেশীয় কবিরাজদের চিকিৎসা-বিভ্রাট ইত্যাদি বাঙালি সমাজের খবরগুলো দর্পণে প্রধান খবরের মর্যাদা পেতো।[৫৯]

এভাবে ক্রমশ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বাংলা সাহিত্যের ভাবীকালের নানা 'সম্ভাব্য রচনার অঙ্কুর' আবিষ্কৃত হয়েছে সমাচারদর্পণের পৃষ্ঠায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বাবুর উপাখ্যান' জাতীয় রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নববাবু বিলাস, কিংবা টেকচাঁদ হুতোম রচিত সামাজিক ব্যঙ্গাত্মক নক্শার শুরু এখানেই।[৬০] সব মিলিয়ে 'সমাচার দর্পণের' পৃষ্ঠাতেই সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির হাতের রীতিশুদ্ধ গদ্য গতিশীল হয়েছে। সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শন হিসেবে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হ'লো ——

> বৃদ্ধের বিবাহ।- দক্ষিণ দেশে ফরকাবাজ নামে এক গ্রামের অবুঝচন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি যাতায়হালয়ে কলিকাতা থাকিয়া শিষ্য যজমান করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করাতে পাঁচশত টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ করিয়া ছিলেন তাহাতে তিনচারি পুত্র ও দুই তিন কন্যা জন্মিয়া সংসার সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতে ছিল ইতোমধ্যে ঐ - ব্রাহ্মণের স্ত্রীর কাল হওয়াতে তিনি দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়া পৈতৃক বাটীতে গেলেন।
>
> সেখানে গিয়া অনেক ঘটকের সাক্ষাতে কহিলেন যে আমার গৃহ শূণ্য হইয়াছে যদি তোমরা আমাকে স্থাপিত কর তবেইত সংসারে থাকি নচেৎ দুই চক্ষু যেদিকে যাইবে সেই দিকেই যাইব। ইহা কহিতে ২ চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া গেল তাহা দেখিয়া ঘটকেরা তাঁহাকে আশ্বাসরূপ ঘোটকারোহন

করাইলেক ও কহিলেক যে এ কোন আশ্চর্য্য মহাশয়ের বয়ঃক্রম হইবেক। তিনি কহিলেন যে প্রায় সত্তরি বৎসর কোষ্ঠী রাখিনা ঠিক বলিতে পারিনা ছেহত্তরের মন্বন্তরের সময়ে আমার বয়স বৎসর পঁচিশ ছাব্বিশ হইবেক আর এই যে দেখিতেছ দন্তগুলা পড়িয়াছে সে শুদ্ধ জল দোষের কারণ আর বেয়ে ধাতু প্রযুক্ত চুল পাকিয়াছে কিন্তু শক্তি এমত অদ্যাপি ত্রিশ পঁচিশ দণ্ড রোজ ২ করি। পরে ঘটকেরা কন্যার অন্বেষনে দিকে ২ গেল যোকায় বৈদ্যবাটীতে আঠার উনিশ বৎসর বয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়া আসিয়া কহিল যে ওহে মজুমদার মহাশয় তোমার ভাগ্য ভাল পরম সুন্দরী উনিশ বৎসর বয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়াছি অবীরা কুলীনের মেয়ে ৫০০ টাকা পণ দিতে হইবেক আর সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা ইহা যদি পার তবে হইবেক আর আমাদের ঘটকালি ১০০ টাকা চাহি। মজুমদার ঐ কথা শুনিয়া আহ্লাদে ডুবু ২ হইয়া কহিলেন যে আজ্ঞা আমি এ সকলি দিব এ কথা প্রকাশ করিবেন না আপনারা শীঘ্র গিয়া লগ্নপত্র করিয়া আইসুন। ঘটকেরা কহিল যে শুন হে মজুমদার যদি তোমার ভল করিলাম তবে আর ঢাক ২ গুড় ২ কি সে কুলীনের মেয়ে তাহার পিতামাতা নাই তত্রাপি অন্য জ্ঞাতি আছে তাহারা হইতে দিবেক না অতএব রাহা খরচের টাকা দেও মেয়ে এই খানে উঠিয়া আনি গিয়া।

ঘটকেরা ১০ টাকা রাহা খরচ লইয়া সেই কন্যার আলয়ে গেল। বালিকা কহিলেন যে কি সম্বাদ। ঘটকেরা সকল কথা কহিলেক। কন্যা সেই দণ্ডে এক পালকীতে আরোহন করিয়া বর পাত্রের গ্রামের নিকটে উপস্থিতা হইল। পাত্রটি সেইখানে গেলেন কন্যা দেখিয়া হুপ্ পাঁচ হাত হইল। পরে কোন ভাগ্যবান লোকের বাটীতে কন্যাকে রাখিলেন পরদিবস বিবাহ হইবেক উভয়ের গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া গেল হাতে সুতা বান্ধিয়া বরপাত্র আপনি নান্দীমুখ করিলেন।

বৈকালে সুশীলা কহিলেন বর কোথা। পরে ছেলেটী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। হাজার যদি শিশুকন্যা হয় তত্রাপি কালের মাহাত্ম্য প্রযুক্ত কহিলেন যে আমি ও বুড়া বরকে বিবাহ করিব না।

এই সম্বাদ লইয়া যত ২ আদবুড়া ও পৌন বুড়া আইবুড়া ছিল তাহারা কেহ ২ গোপ ছাটিয়া দাঁতে মিসি দিয়া কেহ ২ মাথাময় বেড়ি রাখিয়া কালাপাড়ো ধুতি পরিয়া কেহ ঘড়ী একটা চাহিয়া ঢেঁকে দিয়া ও গোঁফে কলফ লাগাইয়া ঐ কন্যার সম্মুখে ঘুরিয়া ২ বেড়াইতে লাগিল ইহা দেখিয়া মজুমদার কহিলেন যে আমার গলায় যিনি ছুরি দিবেন তাহার বংশ থাকিবেক না।

অনেক বুঝান সুজানের পর কন্যা রাজী হইলেন ও কহিলেন যে তবে আমি বিবাহ করিব যদি গহনা ও টাকা আমার হাতে দেয়। তখন ব্রাহ্মণ বলেন রাম মা দুর্গা দিন দিলেন সেই রাত্রিতে তিনি আপন পরিবারের নিকটে আসিয়া কোন ছল করিয়া গহনা লইয়া গেলেন বাটীখানি বন্ধক রাখিয়া ৫০০ টাকা কর্জ করিয়া লইয়া দিলেন বিবাহ হইল বাসরঘরে অস্মার গেলনা। সুশীলা কহিলেন যে আমার পীড়া আছে আমাকে স্পর্শ করিও না। পরে কলকাতা আনিলেন ডাক্তারের ঔষধি দিতে লাগিলেন দশ পোনের দিবসের পর কুলীনের কন্যা আপন কুলে পলাইয়া গেলেন। মজুমদার পাগলের ন্যায় হইয়া বাপুরে মারে শব্দে কান্দিতে ২ বৈদ্যবাটিতে গিয়া দেখেন যে দশ পোনেরজন নেড়া নেড়ী একত্র মহোৎসব করিতেছে। মজুমদার দেখিয়া শুভযাত্রা করিলেন ও নামটি মুখে আনিলেন না।

অতএব শুন বিবাহেচ্ছুক মহাশয়েরা সাবধান ২।[৬১]

বর্ণিত সংবাদটি নিছক সংবাদই নয়। জীবনবোধেরও পরিচায়ক। কুলীন ঘরের বৃদ্ধদের এরূপ বিয়ের কথা, দাম্পত্য বিপর্যয়ের খবর এরূপ সরসভাবে তৎকালীন সংবাদপত্রের পাতায় ছড়িয়ে আছে। কুলীন বৃদ্ধদের এ সমস্ত কেলেঙ্কারি একদিকে নাটক, প্রহসনের উদ্ভব ঘটিয়েছে। অন্যদিকে নারীকে ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দিয়েছে। ঘাটের মরার গলায় বেঁধে

দিয়ে তার মতামতের তোয়াক্কা না করে যে নারীকে জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়ে ফেলা হ'তো; সেই নারী বৃদ্ধকে বিবাহ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে বৃদ্ধকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পেরেছে। পত্রিকায় এ ধরণের সরসকাহিনী পরিবেশিত হওয়ায় অন্তপুরে নারীদের কাছেও পত্রিকাগুলো উপভোগ্য হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে পাঠিকার সংখ্যা বাড়তে থাকে। এর ফলে একদিকে পত্রিকা গ্রাহকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। অন্যদিকে নারীর সম্মুখে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হতে থাকে। ধীরে ধীরে উপন্যাসোচিত নায়িকা চরিত্রের উদ্ভব হতে থাকে। পত্রিকায় প্রকাশিত এরূপ সরস ঘটনার আর একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি

বর্দ্ধমানের কাছে এক গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহে বিরাট এক পণ দাবি করে বসেন। এদিকে কন্যা প্রায় ষোড়শবর্ষিয়া হয়ে গেছে। কাছাকাছি এক সদ্য বিপত্নীক চাকুরীয়া ব্রাহ্মণ ঘটকের মারফত এই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ কন্যার সংবাদ পেয়ে ঘটকের সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণেরবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়।

> ..... বিবাহের বিষয় পণাপণ স্থির হইয়া কন্যাকর্ত্তা কহিলেন আমি বর দেখিব তাহাতে পাত্র কহিল যে আমি বর এই দেখ। বর দেখিয়া তিনি তুষ্ট হইলে বর কহিলেন তোমার কন্যা কোথায় আমিও কন্যা দেখিব। পরে ব্রাহ্মণ কন্যা দেখাইলে ঐ কন্যা ও বর উভয় সন্দর্শণে সুতরাং উভয়ের মনোমিলন হইল। ... বরপাত্র স্নানার্থ তাহার বাটীর খিড়কীর পুষ্করিণীতে গেলেন। ইহা দেখিয়া কন্যাও ঐ ঘাটে গিয়া বরকে কহিল তুমি ওঘাটে চল আমি তোমাকে কিছু কথা কহিব তাহাতে সে ব্যক্তি ঐ বাক্যে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া সেই ঘাটে গেল এবং কন্যাও স্নানের ছলে সেখানে গিয়া তাহাকে কহিল যে আমি কন্যা কিন্তু নির্লজ্জ হইয়া কহিতে হইল ইহাতে তুমি আমাকে বিরূপ ভাবিও না যেহেতুক আমার পিতার ধর্ম্মজ্ঞান নাই কেবল টাকা লইতে অতি তৎপর অতএব যদি তুমি পঁচিশ টাকা খরচ করিতে পার তবে গোপনে আমার মাসীর বাটীতে অদ্য রাত্রিতেই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে অতএব তুমি কোন ছল করিয়া উপবাসী থাক আমিও আপন মাসীর বাটীতে গিয়া বিবাহের উদ্যোগ

করি। ... ঐ টাকা পাইয়া কন্যা আপন মাসীকে কহিল যে আমি এইরূপে বিবাহ করিতে বাসনা করিয়াছি ইহাতে তোমার পরামর্শ কি ? তাহাতে তাহার মাসী মহা আনন্দিতা হইল ...। ... ঐ রাত্রেই শুভবিবাহ হইল। ... প্রাতঃকালে কন্যাকর্ত্তা উঠিয়া তামাকু খাইতেছেন এমন সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ নূতন বস্ত্র পরিধা ও হাতে সূতা বান্ধা ও দর্পণ শুদ্ধা গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। তাহাকে দেখিয়া কন্যাকর্ত্তা কহিলেন তুমি কে। সে কহিল আমি মহাশয়ের জামাতা গত রাত্রিতে তোমার কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। ... এমত সময়ে ঐ কন্যা আসিয়া কহিল শুন পিতা আমি বিবাহ করিয়াছি উহাকে অনুযোগ করা অনুচিত। ... কন্যা আপন স্বামীকে কহিল যে তোমাকে দেখিলেই পিতার রাগ বৃদ্ধি হয় অতএব তুমি বাটী যাও যদি পোনের দিনের মধ্যে তোমাকে আদরপূর্বক পিতা আনেন তবে একশত টাকা তাহাকে দিবা কিন্তু যদি না আনেন তবে ষোল দিনের প্রাতঃকালে ডুলি পাঠাইবা আমি যাইব। এইরূপ কহিয়া তাহাকে বিদায় করিল। এইরূপ কহিয়া তাহাকে বিদায় করিল। পরে ব্রাহ্মণ আর আর স্থানে ও ভদ্রলোকের নিকট অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই তাহার পক্ষ হইল না। তাহাতে ব্রাহ্মণ নিরুপায় দেখিয়া ভাবিল যদি জামাই না আনি তবে কিছুই পাইনা। সুতরাং চৌদ্দদিবসের প্রাতঃকালে জামাই আনিতে গেলেন। জামাই শ্বশুরকে দেখিয়া মহাসমাদরপূর্বক একশত টাকা শুদ্ধা শ্বশুর বাটীতে গিয়া শ্বশুরকে ঐ টাকা দিয়া আপন স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাটী আনিল।[৬২]

এরূপ বিয়ের সংবাদ যে অশ্রুতপূর্ব,সংবাদ বর্ণনান্তে পত্রিকা সম্পাদক তা অবশ্য উল্লেখ করেছেন। নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমস্যাকে কেন্দ্র করে পরিবারে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে, বিপর্যয় সৃষ্টি হ'তে পারে উপরের উদ্ধৃতিটিতে তা নিহিত। এ সমস্যা পাঠক

মনেও নাড়া দেয়। নাড়া দেয় নরনারীর জীবনকে। উপন্যাসের একটি প্রধান উপাদান প্রণয়। এই প্রণয়ের সুষ্ঠু স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যযুগীয় পরিবেশ ছিল পরিপন্থী। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ ছিল এর প্রধান অন্তরায়। উদ্ধৃতিটিতে লক্ষণীয় কন্যা ষোড়শবর্ষীয়া। পাত্রপাত্রীর সন্দর্শনে এখানে অনুরাগের সূচনা হয়েছে। এর ফলেই নারী তার নিজের যতামতটুকু প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়েছে। এপথেই ক্রমশঃ অগ্রসর হয়েছে নরনারীর প্রণয়। সূচিত হয়েছে সুস্থ দাম্পত্যবোধ।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শেই বাঙালির আত্মসচেতনতার জন্ম হয়। এর ফলে সমাজ সংস্কারকেরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন নানাপ্রথার অবলুপ্তির অপরিহার্যতা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই সমাজ সংস্কারে ভীত ত্রস্ত নারী উপলব্ধি করতে পেরেছে স্বীয় সত্তাকে। সমাজ সংস্কারে পিষ্ট দলিত নারীর স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য ছিল প্রশ্নাতীত। এর ফলে স্বাধীন কর্মের কথা ছিল তাদের ভাবনারও অতীত। কিন্তু পরিবর্তমান সমাজের বুকে নারীর বেঁচে থাকার সমস্যা নিয়ে যখন আলোড়ন ওঠে, নারী তখন আবিষ্কার করে তার বেঁচে থাকার পথ। সেই উত্থানের পথে এটি (উপরের উদ্ধৃতিটি) একটি দৃষ্টান্ত। এখানে জীবনবোধের গভীরতাও পরিস্ফুট। জীবনবোধের এই গভীরতা উপন্যাসের প্রাণ। এদিক দিয়ে বিচার করলে উপন্যাসোচিত জীবনবোধের সন্ধান এখানেই প্রথম লক্ষণীয়।

সম্বাদকৌমুদী (১৮২১, ডিসেম্বর), রাজা রামমোহন রায় ছিলেন সম্বাদকৌমুদীর পৃষ্ঠপোষক। শ্রেষ্ঠ লেখকও। সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে রামমোহন নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন এই পত্রিকায়। মিশনারীদের পরিচালিত সমাচার দর্পণের হিন্দুবিরোধী প্রচারের প্রতিরোধ কল্পে রামমোহন এই পত্রিকাটি প্রকাশে তৎপর হয়েছিলেন। ফলে পত্রিকাটিতে কৌতূহল জনক নানা সংবাদ পরিবেশিত হ'তো। তাছাড়া দৃষ্টিভঙ্গির উদারতার জন্যেও ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবঙ্গ সমাজের সর্বমুখী বিকাশে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল ব্যাপক।[৬৩]

সমাচারচন্দ্রিকা (১৮২২), পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রক্ষণশীল ভবানীচরণ রামমোহনের সতীদাহ প্রথা নিবারণ-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা প্রকাশিত করেন। তাছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে সমকালীন আগ্রহও পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে ও বাংলা গদ্যের বৃত্তান্তে এই পত্রিকাটিকে রক্ষণশীলদলের মুখপত্র বলা হয়ে থাকে। পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার পরের বছরই (১৮২৩) ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়' প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে কলকাতা শহরে জীবিকার জন্য বাঙালি মধ্যবিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংকীর্ণ চাকরির বাজার - এসবই ভবানীচরণের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। ইংরেজি শিক্ষা বা সংস্কৃতি নয়, ইংরেজি বাণিজ্যের প্রসারের পটভূমিতেই নগর বাংলায় 'বাবুসংস্কৃতি'র বীজ উপ্ত হয়। সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অবলম্বনে কলকাতার বাবুসমাজ সম্পর্কে কলম ধারণ করেছিলেন। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করবো। এখানে আমাদের জেনে রাখা দরকার কলকাতার সমসাময়িক জীবনভিত্তিক এই সমস্ত রচনা বাংলা-গদ্যকে ক্রমশ: জীবননিষ্ঠ করে তুলেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে সাময়িকপত্রের জন্যই। কলকাতার একশ্রেণীর ধনী বাঙালির জীবনের কথা সাময়িকপত্রের বিষয় হয়ে উঠায়, একদিকে বাবুসমাজের শ্রেণীগত রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। অন্যদিকে ক্রমান্বয়ে হয়েছে সাহিত্যিক গদ্যের সাবলীল প্রতিষ্ঠা। উপন্যাসের ভিত্তি স্থাপনের প্রক্রিয়ারও সূত্রপাত হয়।

বঙ্গদূত (১৮২৯, মে), বাংলাভাষার একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন নীলরত্ন হালদার। পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ। বাংলার সমাজনীতি, শিক্ষা - ইত্যাদি বিষয়ে আমূল আলোড়নের ফলে শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির সচেতন ভাবনার পরিচয় মেলে পত্রিকাটিতে।

সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১, জানুয়ারী), পত্রিকাটি ঈশ্বরগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কাব্য কবিতার বলিষ্ঠ বিচার এই পত্রিকাটিতে সূত্রপাত হয়েছিল। তাছাড়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে পাঠক সাধারণের সামনে জাতীয় জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাও পত্রিকাটিতে লক্ষণীয়। ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশ প্রেম তীব্র এবং সুস্পষ্ট। স্বদেশ কবিতায় তিনি লিখেছেন ——

কতরূপ স্নেহকরি দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে গুপ্ত কবির এই জাতিপ্রেম আর স্বাভিমানবোধ বাংলার সমাজ-জীবনে ছড়িয়ে পড়েছিল। সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠাতেই বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর কৈশোর-প্রতিভা প্রথম অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল।[৬৪] এমনি করে সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে অনাগত জীবনপথের বৃহৎদ্বার উন্মোচিত হয়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩), পত্রিকাটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। হুগলি কলেজ ও অন্যান্য অনেক বিদ্যালয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল।[৬৫] প্রথম পর্বের বাংলা গদ্যের পরিণতি যাঁদের হাতে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তত্ত্ববোধিনীর নিয়মিত লেখক। অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজ-নারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ চিন্তাশীল গদ্য লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ, তত্ত্ব-বোধিনী বাংলা গদ্যসাহিত্যের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। বাংলা গদ্য ভাষা সংবাদ সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতে জনসংযোগের দায়ে যে গদ্যভাষা আশ্রয় লাভ করেছিল, ক্রমশঃ তা প্রাঞ্জলতা, বহুমুখিতা - সৃজনকর্মের উপযোগী বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে। তত্ত্ববোধিনী'র লেখকগোষ্ঠীর অনেকের রচনাতেই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ লক্ষণীয়।[৬৬] বস্তুত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই ব্যক্তিত্বধর্মী বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তীকালে আধুনিকতাধর্মী সাহিত্যের সৃজনশৈলীর ধারক ও বাহক হয়েছে এই গদ্যরূপ। বাংলা সাহিত্য

বিকাশের তাই শ্রেষ্ঠবাহন সাময়িকপত্র। এদিক দিয়ে তত্ত্ববোধিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভাষার দুরূহতা ও মূল্যাধিক্যের জন্যে তখন পাঠ্যপুস্তকের প্রচার ছিল সীমিত। কিন্তু সাময়িকপত্রগুলি কমমূল্যের হওয়ায় এবং ভাষার সরলতার জন্য পাঠককে বেশি আকৃষ্ট করেছে। এর প্রমাণ মেলে সমাচার দর্পণের একটি বিবৃতিতে

> আমার ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া অবগত হইলাম যে পূর্বাপেক্ষা এতদ্দেশীয় সম্বাদ কাগজের গ্রাহক গত বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইয়াছে। এবং তৎ-কাগজ প্রকাশক মহাশয়েরা পূর্বাপেক্ষা ক্রমশঃ দূর দূর দেশীয় সম্বাদ ঐ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন ইহার কারণ আমরা এই বোধ করি যে লোকেদের পূর্বাপেক্ষা জ্ঞানের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে।[৬৭]

সংবাদপত্রের পাঠকমণ্ডলী বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর এই পাঠক সমাজ কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়ে আর তৃপ্ত হতে পারছিল না।[৬৮] সংবাদপত্র একদিকে সমকালকে ধরে রাখে অন্যদিকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার সম্ভাবনাকে সূচিত করে। তাই সংবাদপত্রে পরিবেশিত সাধারণ পাঠকের উপযোগী সংবাদ ও নানা সরস কাহিনী তাদের আকৃষ্ট করেছে। সংবাদপত্র পাঠের এই আগ্রহই প্রকৃতপক্ষে নবযুগের সমকালীন জীবনবিষয়ক আগ্রহের প্রাথমিকরূপ। সংবাদপত্রের এই পাঠকমণ্ডলী ধীরে ধীরে বাংলা উপন্যাসের পাঠক-মণ্ডলীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

সার্থক গদ্য সাহিত্যের সাবলীল ও উপযুক্ত মাধ্যম লৈখিকগদ্য সংবাদ সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। স্ত্রী শিক্ষার অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ও উদ্যোগী কর্মী প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর সুহৃদ রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা'(১৮৫৪) প্রকাশ করেন। তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকদের জন্য ছাপা হইতেছে।[৬৯] ফলে পত্রিকাটিতে স্ত্রীলোকদের উদ্দেশ্যে নানা ধরণের সরস কাহিনী

ছাপা হতো। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ধারাবাহিক রচনাপ্রকাশে মাসিক পত্রিকা বাঙালিসমাজে যথেষ্ট আকর্ষণের কারণ ছিল। বাঙালির অন্তঃপুরেও সমাদৃত হয়েছিল।

নবজাগরণের অন্যতম অবদান নারী সম্পর্কে নূতন দৃষ্টির প্রকাশ। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন, বহুবিবাহ ও কৌলীণ্য সম্পর্কে সমাজের বিরূপতা নারীর ভাবমূর্তি নির্মাণে সাহায্য করেছে। নির্বিশেষ মানুষ ও জনজীবন সম্পর্কে নব্যলেখকদের গভীর আগ্রহ ও কৌতূহল সংবাদপত্রেই আত্মপ্রকাশ করে। উপন্যাসের প্রস্তুতিপর্বে মানবজীবনের অপার-রহস্য সম্পর্কিত কৌতূহল সৃষ্টির কাজটি ছড়িয়ে দিয়েছে সাময়িকপত্র। আবার উপন্যাসের মাধ্যম গদ্যশৈলীকেও ক্রমশঃ করেছে সাবলীল। প্রসঙ্গত সুকুমার সেনের মন্তব্য বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। "১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আজ অবধি দেখিতেছি যে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য (এবং বাঙ্গালা আধুনিক সাহিত্য) প্রধানত সাময়িক পত্রিকার আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠিয়াছে।"[৭০] মোটকথা নবজাগরণের পটভূমিকায় সাময়িক পত্রগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। নবচেতনা মানুষকে চিন্তা ও স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছে। পক্ষান্তরে তৎকালীন সাময়িকপত্রগুলি বিভিন্ন পত্র প্রেরকের পত্র প্রকাশ করে এবং সম্পাদক গোষ্ঠীর নিজস্ব মতামতকে লিপিবদ্ধ করে জনমত গঠনের সূক্ষ্ম কর্তব্যটি সম্পাদন করেছে। এছাড়াও মৌলিক রচনা প্রকাশ করে বাঙালির সৃজনশীল প্রতিভাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে।

সংবাদ সাময়িক পত্রের মাধ্যমে একদিকে মনন ও স্বাধীন চিন্তার এক ব্যাপক পটভূমি গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে হিন্দুকলেজ ও তদুত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যুক্তি-বিচার-মূলক আধুনিক শিক্ষায় মনের পুষ্টি সাধন করেছে। বস্তুত সাময়িকপত্রে বাদানুবাদ ও বিচিত্রমুখী আলোচনার মাধ্যমে সাহিত্যিক গদ্যরচনার এবং তা অনুধাবন করতে পারার

উপযোগী মন ও মনন পরিশীলিত হয়ে উঠেছিল। স্ত্রী শিক্ষার প্রচেষ্টাও তখন দেখা দিয়েছিল। স্কুল সোসাইটি কলকাতায় বালিকাদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। এর কিছুদিন পরে রাধাকান্তদেব তাঁর বাড়ীতে মেয়েদের জন্য একটি পাঠশালা খুলেছিলেন। বালিকারা সেখানে ইংরেজি বাংলা উভয় ভাষা শিক্ষা লাভ করতো।

পাশ্চাত্য জীবনচেতনার সান্নিধ্যে বাঙালি নরনারীর রোমান্টিক জীবনবোধ প্রসার লাভ করে। মুদ্রাযন্ত্র, পুস্তক, সাময়িক পত্র পত্রিকার প্রসারে ভক্তি বিভোর শ্রোতার পরিবর্তে কৌতূহলী পাঠক সমাজের সৃষ্টি হয়। পাঠক সমাজের কৌতূহল চরিতার্থ করবার ক্রমবাসনায় উদ্ভূত হয় সমসাময়িক নানা সংস্কার আন্দোলনের পরিচয় বাহক সাহিত্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাগদ্য সাময়িক পত্রিকা ও বিতর্ক সঙ্কুল আন্দোলনে আবদ্ধ ছিল। কারণ তখন সামাজিক ভাঙাগড়ার যুগ। নানা সমস্যায় সাধারণের মন তখন উদ্বিগ্ন। এই পর্বেই কয়েকজন গদ্য নিবন্ধকারের আবির্ভাব হয়। অবশ্য তাঁদের অধিকাংশ রচনা ও গ্রন্থ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমার্ধে যার প্রস্তুতি ও প্রয়াস দ্বিতীয়ার্ধে ঘটে তার পূর্ণ বিকাশ। বস্তুত, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির জীবন ও সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে বিস্ফোরণ অনুভূত হয়। আর তার সবটাই তদানীন্তন সাহিত্যে, বিশেষতঃ গদ্য সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ক্রমশ যুগচেতনাকে, মানুষের চাহিদাকে পূর্ণ করার জন্যে উপযুক্ত আঙ্গিকের সন্ধান করেন প্রতিভাধর সাহিত্যিকেরা। নবাবিষ্কৃত গদ্যকে বাহনরূপে প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্যিকেরা অগ্রসর হ'তে থাকেন নূতন ফর্ম এর দিকে। এর ফলেই আবিষ্কৃত হয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যম। মহাকাব্য, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস-কল্প, গীতিকবিতা, গীতিকা - সবকিছুতেই আঙ্গিকের পরিবর্তন লক্ষণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ তাই বহন করে নিয়ে এলো সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের যুগ।

সাহিত্যভাবনা ক্রমশ আখ্যায়িকা নির্মাণে সমস্ত বহিরঙ্গ কারুকাজ বিযুক্ত হতে থাকে। পাশ্চাত্ত্য জীবনবোধের প্রেরণায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নরনারীর নবজীবনবোধের প্রতি। কেননা ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে ইতিমধ্যে বাঙালির জীবনে এসেছে পরিবর্তনের ঢেউ। আর সেজন্যই প্রেম, প্রকৃতি নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, মানবিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, বাঙালির ঐতিহ্যবোধে জাগে পরিবর্তন। প্রতিষ্ঠা ঘটে আধুনিক যুগের। সবদেশেই উপন্যাস আধুনিক যুগের সাহিত্য ফসল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই হয় তার আবির্ভাবের শর্ত পূরণ তথা ক্ষেত্র প্রস্তুত। আর তার পূর্ণসিদ্ধি ঘটে বঙ্কিমচন্দ্রে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রে পৌঁছোনোর পূর্ব পর্যন্ত নানাপথে চলে তার নবনিরীক্ষা। উপন্যাসের ক্ষেত্র প্রস্তুতির ইতিহাসে এবার আমরা সেই বিচিত্র পথের তথা বিভিন্ন রূপকল্পের সন্ধানী।

সূত্রনির্দেশ

১। ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা কুচবিহাররাজ নরনারায়ণ ভূপের লেখা একটি চিঠিই হচ্ছে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত। চিঠিটির ভাষার উল্লেখ করা হ'লো : 'তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।'

২। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা সাধুগদ্যের প্রতিচ্ছবি মেলে সেকশুভোদয়ায়।

৩। কাস্তিগুপ্ত : উনিশ শতকের শেষার্ধবর্তী বাংলা গদ্যের রূপ-রীতি, ইন্দুপ্রভা, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ.৩

৪। 'আহা মাতা তুমার রাজা আমাকে ডাকিতেছিলো তুমার রাজা সনে আমাকে কার্য্য না হয় তুমার রাজা সনে বেদা মানিয়া আমী জাইবো। আহা মহারাজেশ্বর গোপীচন্দ্র তুমি মায়া এড়িতে না পারো তুমি উদনা পদুমার সঙ্গে সুখে রাজ্য করিয়া থাকো তুমার সনে আমার কার্য্য না হয়।' (উৎস : সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য : ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৩, পৃ.৮)

৫। মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ পোর্তুগালের এভোরা শহরের অধিবাসী এবং পূর্বভারতের মণ্ডলীভুক্ত অগস্তিনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে আসেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন বলে জানা যায়।

৬। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালের লিসবন শহরে সম্পূর্ণ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯১। গ্রন্থটির ভূমিকা থেকে জানা যায় ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাওয়াল পরগণার নগরীতে লিখিত হয়। মূল পর্তুগীস অংশ মনোএল-এর লেখা। তিনি সম্ভবতঃ কোনও দেশীয় খ্রীষ্টানকে দিয়ে বাংলা অনুবাদ করিয়েছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের ফরাসীপাদ্রি ফাদার গেরেঁ(Guerin) গ্রন্থটির বিশুদ্ধিকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি ডাওয়ালে প্রচলিত মৌখিক ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় বাংলা এবং ডানদিকের পৃষ্ঠায় পোর্তুগীস ভাষায় গুরুশিষ্যে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মের মহিমা কীর্তিত হয়েছে।

৭। দোম আন্তেনিয়ো দো রোজারিও ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র। তাঁর সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত যে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূষণার রাজপুত্র (বাল্যকালে) মগেদের দ্বারা অপহৃত হয়ে আরাকানে নীত হন। সেখানে ফাদার মনোএল দা রোজারিও নামে একজন সেণ্ট অগস্টিন মণ্ডলীর ধর্মযাজক তাঁকে উদ্ধার করে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করেন। কথিত আছে তাঁর প্রভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।

৮। গ্রন্থটি রোমান হরফে লেখা হয়েছিল। গ্রন্থটি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনে মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু এর কোন মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া যায়নি। ফলে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল কিনা - সে বিষয়ে সংশয় জাগে। রোমান হরফে লেখা এর পাণ্ডুলিপি এখনও পর্তুগালে আছে।

৯। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ·২৮২।

১০। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য , ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৩, পৃ·১

১১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ·২৮৪

১২। এ প্রসঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধান-ব্যোপদেবের মুগ্ধবোধ, কেরী সাহেবের Sanskrit Grammar , কোলব্রুক সম্পাদিত অমরকোষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারত মুদ্রিত করে প্রচার করেছিলেন। বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ, নানাশাস্ত্র, 'সমাচারদর্পণ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং 'দিগদর্শন' নামে মাসিক পত্রিকাও উল্লেখযোগ্য। এসব প্রকাশনার পেছনে ধর্মীয় উদ্দেশ্যই প্রচ্ছন্ন ছিল। তাদের ধারণা ছিল অলীক ব্যাপারে পূর্ণ সংস্কৃত সাহিত্য ছাপা হলে শিক্ষিত লোকে হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবে, পক্ষান্তরে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

১৩। ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়) , দে'জ পাবলিসিং, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ·৯২ এবং সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (২য় খণ্ড), ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭০, পৃ·১৪

১৪। সেকালের সমাজে ইসলামী শব্দ প্রচুর ব্যবহৃত হত। তারই প্রভাবে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' রামরাম এত বেশী আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করেছেন যে এখন এ পুস্তিকা পাঠকদের নিকট অতি বিকট মনে হবে। (অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ·২৮৮)

১৫। রামরাম বসু : লিপিমালা, ভূমিকা।

১৬। কালিদাস রায় : বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (১ম খণ্ড), ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ·৭

১৭। প্রবোধ চন্দ্রিকার কোন কোন স্থলে একটু দুরূহ সংস্কৃতবাহুল্য আছে তা বাদ দিলে তাঁর গদ্যগ্রন্থে একইসঙ্গে গুরুগম্ভীর ক্লাসিকরীতি, সরল পরিচ্ছন্ন সাধুভাষা এবং স্থানীয় উপভাষার প্রভাব দেখা যায়। আবার রাজাবলির প্রয়োজন স্থলে বহু আরবী ফারসী শব্দও ব্যবহার করেছেন। আবার স্থূল রঙ্গ রসে-পূর্ণ লোক ভাষারও তিনি অমর্যাদা করেননি।
(অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ·২৮১)

১৮। প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত : বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ·৩৭

১৯। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ·২৮১

২০। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (দ্বিতীয় খণ্ড), ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ·১৩

২১। তদেব, পৃ·১৪

২২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত : রামমোহন রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ·৩১

২৩। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যগ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ·৩৩

২৪। রামগতি ন্যায়রত্ন : বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৪২, পৃ·১৮৭

২৫। কালিদাস রায় : প্রাগুক্ত, পৃ·২৩

২৬। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ·৪৫৫-৪৫৬

২৭। প্রমথনাথ বিশী ও বিজিত দত্ত সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ·৫৩

২৮। বিদ্যাসাগর চরিত : চরিত্রপূজা, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, পৃ·১৪

২৯। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ.৩০১

৩০। প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত: প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮

৩১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম রচনাবলী(২য় খণ্ড), 'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ.৮৬৩

৩২। মাসিক পত্রিকার বিশেষ ঘোষণায় জানানো হয়েছিল - 'যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই পুস্তাব সকল রচনা হইবেক।'

৩৩। 'উনিশ শতকে নূতন বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই অনেক বেশী। বস্তুত ইউরোপীয় মডেলের কোন আধুনিক নবজাগরণ বাংলাদেশে অথবা বাঙালি সমাজে ঘটেনি। ফলে বাংলায় যে নবজিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল তাকে 'নবজাগরণ' আখ্যা দেবার অর্থ হ'লো সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নিদারুণ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা' - বলেছেন বদরুদ্দীন উমর। বিনয় ঘোষ বলেছেন' বাংলার নবজাগৃতি' একটি অতিকথা। সমালোচকের মন্তব্যকে স্মরণ রেখেও বাংলার নবযুগের এই সূচনাকে সংকীর্ণ অর্থে নবজাগরণ বলছি।

৩৪। বিনয় ঘোষ : বাংলার নবজাগৃতি, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ.৩১

৩৫। তদেব, পৃ.৪২

৩৬। আসলে ব্রিটিশের প্রধান লক্ষ্য ছিল, নিরাপদ - নিশ্চিন্ত শাসন-শোষণের উদ্দেশ্যে এদেশের আইনশৃঙখলা ও সামাজিক স্থিতি (Social stability)যেকোনো উপায়ে বজায় রাখা। ব্রিটিশ শাসকেরা এদেশের সমাজের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অথবা সামাজিক অঙ্গবিন্যাসে তাই এমন কোনো দূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটাতে চান নি - যাতে সামাজিক স্থিতি নষ্ট হতে পারে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের অভ্যুদয় হ'লে যে সামাজিক সচলতা ও পরিবর্তনের সূচনা হত, তার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্বিঘ্নে শোষণ-শাসনের সুবিধা হ'তোনা। দেশী বিদেশী লুণ্ঠন স্বার্থে সংঘাত হতো। কাজেই রেনেসাঁসের অর্থনৈতিক ভিত্তি এদেশে গড়ে তোলায় তাদের কোনো স্বার্থ ছিল না। ফলে যে ধরণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গড়নের পরিবর্তন ব্রিটিশ আমলে দেখা দিয়েছিল তাতে সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাবিন্যাস (Institutional power-structures) যেমন জাতিবর্ণভেদ, ধর্মসম্প্রদায়ের বৈষম্য ইত্যাদির কোনো উন্নতিশীল পরিবর্তন হয়নি।

৩৭। বিনয় ঘোষ : প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৩

৩৮। কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) মূল উদ্দেশ্য ছিল ভূমিরাজস্ব নিয়মিত আদায়ের ব্যবস্থা করা। তখন ভূমিরাজস্ব ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস। জমিদারেরা জমির মালিক হলে তারা কৃষির উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেবে এমন একটা আশা শাসকশ্রেণীর ছিল। জমিদারকে রায়তদের দেয় খাজনার নয়-দশমাংশ রাজস্ব নির্ধারিত হল চিরকালের জন্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলায় ব্যাপক জমি হস্তান্তর ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে জমিদারশ্রেণী প্রবল এবং বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়। সরকারী ব্যবস্থার পাশাপাশি গড়ে উঠে জমিদারের শাসনব্যবস্থা। কৃষকদের একটি বড় অংশ জমিতে স্বত্ব হারিয়ে খাজনাদাতা প্রজায় পরিণত হয়। জমিদার ইচ্ছামত কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতেন, আবওয়াব আদায় করতেন এবং খাজনা বৃদ্ধি করতেন। জমিদারেরা যাতে রায়তের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করতে পারে সেজন্য ১৭৯৯ সালে সপ্তম রেগুলেশন (হফ্তম আইন) চালু হয়। এই আইনে খাজনা না দেবার জন্য জমিদার প্রজাকে হাজতে আটক রাখতে পারবেন এবং বকেয়া খাজনা উদ্ধারের জন্য তাদের ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করতে পারবেন।

৩৯। বদরুল হাসান : উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস, জগৎমাতা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ.৮

৪০। অশোককুমার দে : বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ.৯০

৪১। প্রমথনাথ বিশী : বঙ্কিম সরণী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৭৩, পৃ.১৬০

৪২। বদরুল হাসান : প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

৪৩। তদেব, পৃ.৩৮

৪৪। বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ.৪২২

৪৫। A.F. Polerd : Factors in Modern History, London, 1932, p.43

৪৬। ইংরেজি রাজভাষা, সমাজে তা সম্ভ্রম উদ্রেককারী এবং ভবিষ্যৎ জীবিকার্জনের সহায়ক। তাছাড়া ইংরেজি লেখা ইংরেজরা পড়ত, কোনো লেখা তাদের ভালো লাগলে লেখকের সম্মানিত হবার সম্ভাবনা থাকতো।

৪৭। স্বপন বসু : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ.২৩০

৪৮। বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পাঠভবন, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ.১৭

৪৯। দেবীপদ ভট্টাচার্য : উপন্যাসের কথা, জি·এ·ই পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ·১৩৯

৫০। শর্মিলা বসু দত্ত : 'নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ : বাংলা উপন্যাস' - (১৮৬৪-১৯১৪), প্রমা, কলিকাতা, ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : অক্টোবর - ডিসেম্বর নবুই, মার্চ ১৯৯১,

৫১। সুপন বসু : প্রাগুক্ত, পৃ·২৩৭

৫২। দেবেশ রায় : উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য, পাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ·১৬

৫৩। তদেব, পৃ·১৬

৫৪। তদেব, পৃ·২৭-২৮

৫৫। প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত: প্রাগুক্ত, পৃ·৪৯

৫৬। দেবেশ রায় : প্রাগুক্ত, পৃ·৭৬

৫৭। সুকুমার সেন : বাঙালা সাহিত্যে গদ্য, প্রাগুক্ত, পৃ·৪২

৫৮। দেবেশ রায় : প্রাগুক্ত, পৃ·৮৫

৫৯। তদেব : পৃ·৮৫

৬০। ভূদেব চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ·১০৯

৬১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৫৬, পৃ·(১১৬-১১৭), উদ্ধৃত সমাচার দর্পণ পত্রিকা, ৩০ জুন ১৮২১

৬২। তদেব, পৃ·২৭১, উদ্ধৃত সমাচার দর্পণ পত্রিকা, ১০·১১·১৮২১

৬৩। ভূদেব চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ·১১২

৬৪। তদেব, পৃ·১১৫

৬৫। সুকুমার সেন : প্রাগুক্ত, পৃ·৪৫

৬৬। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্তের রচনার মধ্যে স্বকীয় স্টাইল লক্ষণীয়।

৬৭। সমাচার দর্পণের ১৮৩০ এর ৩০শে জানুয়ারি তারিখের বিবৃতি, দেবীপদ ভট্টাচার্য : উপন্যাসের কথা, জি·এ·ই· পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮২, উদ্ধৃত, পৃ·১৩১

৬৮। তদেব,

৬৯। তদেব,

৭০। সুকুমার সেন : প্রাগুক্ত, পৃ·৪২